HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – জীবমন্ডল

টপিক – ০১ পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য
টপিক ০২: জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ আঞ্চলিক এলাকা
টপিক ০৩: বাংলাদেশের বনাঞ্চল
টপিক ০৪: ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্র
টপিক ০৫: পৃথিবীর প্রধান প্রধান ইকোসিস্টেম
টপিক ০৬: বায়োম
টপিক ০৭: জলজ বায়োম
টপিক ০৮: বাংলাদেশের বায়োম
টপিক ০৯: পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কার্বন চক্র
টপিক ১০: পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় নাইট্রোজেন চক্র
টপিক ১১: প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষণ: মাটি দূষণ, বায়ু দূষণ,পানি দূষণ, শব্দ দূষণ

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ১২: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান
টপিক ১৩: বহুনির্বাচণী প্রশ্ন সমাধান

পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য

জীববৈচিত্রা বা Biodiversity পরিভাষাটির উদ্ভব হয়েছে biological & diversity শব্দদ্বয়ের মিশ্রণে। ১৯৮৬ সালে ডব্লিউ, রোজেন (W. Rosen) সর্বপ্রথম Biodiversity শব্দের প্রবর্তন করেন। জল, স্থল ও অন্তরীক্ষে বসবাসরত জীবসমূহের মধ্যে বিভিন্নতাকেই জীববৈচিত্রা বলা হয়। জীববৈচিত্র্য বলতে শুধু প্রজাতিগত বিভিন্নতাকেই বোঝায় না বরং ভূপৃষ্ঠে বসবাসকারী সকল প্রকার জীবের মধ্যে বিরাজমান জিনগত ও পারিবেশিক বিভিন্নতাকেও বোঝায়। বাস্তুতন্ত্রের প্রতিটি জড় ও জীব উপাদান একটি অপরটির সাথে এমন নিবিড়ভাবে জড়িত যে, একটির সামান্য পরিবর্তন হলে অন্যগুলোতেও তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এমনকি একটি জড় উপাদানের পরিবর্তনও সমস্ত জীব উপাদানকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। তাছাড়া জীব উপাদানসমূহ একটি অপরটির উপর এমনভাবে নির্ভরশীল যে, একটির ধ্বংস সাধন হলে অপরটির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। সুতরাং সহজ কথায় বলা যায়, 'ভূপৃষ্ঠে বসবাসকারী সকল প্রকার জীবের মধ্যে বিদ্যমান প্রজাতিগত, জিনগত ও বাস্তুতান্ত্রিক বিভিন্নতাকে সম্মিলিতভাবে জীববৈচিত্র্য বলে'।

জীববৈচিত্র্যের স্থানিক ভিন্নতা (Spatial Variations in Blodiversity)

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে জীববৈচিত্র্য বিভিন্ন রকমের হয়। কোনো এলাকা জীববৈচিত্র্যে খুবই সমৃদ্ধ আবার কোনো কোনো এলাকায় জীববৈচিত্র্য খুবই অল্প। নিচে জীববৈচিত্র্যের স্থানিক ভিন্নতার কারণ তুলে ধরা হলো:

১. ভৌগোলিক অবস্থা (Geographic condition): কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানের ভৌগোলিক অবস্থার ওপর ঐ স্থানের জীববৈচিত্র্য নির্ভর করে। সাধারণত নদী ও গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আর্দ্র আবহাওয়ায় পর্যাপ্ত পরিমাণ বনভূমি গড়ে উঠে। তাই এসব স্থানের জীববৈচিত্র্য খুবই সমৃদ্ধ হয়। অন্যদিকে, ঠাণ্ডা আবহাওয়া, তুষারপাত ও বরফাচ্ছন্ন অঞ্চলে জীববৈচিত্রা তেমন সমৃদ্ধ হয় না। এসব স্থানে খুবই কম জীববৈচিত্র্য দেখা যায়। পৃথিবীর জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ কয়েকটি অঞ্চল নিম্নরূপ-

বাংলাদেশ; শ্রীলঙ্কা; পূর্ব হিমালয়; মালয়েশিয়ান পেনিনসুলা; মাদাগাস্কার; হাওয়াই দ্বীপ; দক্ষিণ-পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া; তানজানিয়া; কেন্দ্রীয় চিলি অঞ্চল; পশ্চিম আমাজানের উঁচুভূমি; ক্যালিফোর্নিয়ার উদ্ভিদ সমৃদ্ধ অঞ্চল ও ভারতীয় উপ-অঞ্চল।

২. ভৌগোলিক সীমানা ও আয়তন (Geographic extent and area): পৃথিবীর যেকোনো বিশেষ এলাকার সীমানা ও আয়তন সেখানকার জীববৈচিত্র্যকে প্রভাবিত করে থাকে। যেমন- একই বৈশিষ্ট্যের আবাস হলেও দ্বীপ বা ক্ষুদ্র অঞ্চলের তুলনায় বৃহত্তর এলাকাগুলোতে বেশি সংখ্যক প্রজাতির জীব বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে, দ্বীপসমূহে বেশি সংখ্যক নিজস্ব ফ্লোরা (flora) বা ফনা (fauna) দেখা যায়। এ রকমের জীবকে Endemic জীব বলে। এদেরকে সহজে অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। যেমন-বোস্তামী কচ্ছপ, চিত্রিত ঘড়িয়াল প্রভৃতি সরীসৃপ, মনিপুরী কোয়েল, ছোট ফুরিক্যান প্রভৃতি পাখি, কালো বানর, সিংহলেজী বানর, ওরাংওটাং, কালো ভল্লুক, গাজোয় ডলফিন প্রভৃতি স্তন্যপায়ী প্রাণী ওরিয়েন্টাল বা প্রাচ্যদেশীয় ভৌগোলিক অঞ্চলের Endemic প্রাণী। এই প্রাণীগুলোকে পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায় না।

৩. জলবায়ু (Climate): জলবায়ু কোনো ভৌগোলিক এলাকার জীববৈচিত্র্যের ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। সাধারণতভাবে আর্দ্র ও উষ্ণমণ্ডলীয় এলাকাগুলোতে অধিক জীববৈচিত্র্য দেখা যায়। এসব এলাকার বেশি বৃষ্টিপাত ও উষ্ণ আবহাওয়া জীববৈচিত্র্যের জন্য বিশেষ সখায়ক। তুলনামূলকভাবে যেসব এলাকার অর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় ও জলবায় শুল্ক ও শীতল সেখানে জীববৈচিত্র্য খুব গল্প দেখা যায়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – জীবমন্ডল

টপিক – ০২ জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ আঞ্চলিক এলাকা

জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ আঞ্চলিক এলাকা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ আঞ্চলিক এলাকা

যেসব প্রজাতি শুধু একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে পাওয়া যায় তাদেরকে আঞ্চলিক প্রজাতি বলা হয়। সংরক্ষণের দিক থেকে এ সকল প্রজাতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এর যেকোনো একটি প্রজাতি বিলুপ্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে সম্পূর্ণ প্রজাতি বিলুপ্ত হওয়া। কারণ বিশ্বের অন্য কোথাও ঐ প্রজাতি আর দেখা যায় না। বিবর্তন প্রক্রিয়ার এক চমৎকার নিদর্শন আঞ্চলিক প্রজাতি।

স্বাভাবিকভাবে আঞ্চলিক প্রজাতি ও তাদের আবাস সংরক্ষণের গুরুত্ব খুবই বেশি। কারণ এসব প্রজাতি একবার হারিয়ে গেলে চিরতরে হারিয়ে যায়। আঞ্চলিক প্রজাতির অবস্থানের ওপর নির্ভর করে ১৯৮৮ সালে ব্রিটিশ পরিবেশবিদ মায়ার্স বিশ্বের বারোটি অঞ্চলকে চিহ্নিত করেছেন। যথা- ১. যাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ, ২. নিউ ক্যালেডোনিয়া, ৩. কলম্বিয় শাকো, ৪. অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড, ৫. ইকুয়েডরের পশ্চিমাঞ্চল, ৬. ফিলিপিনস, ৭. আমাজান নদীর পশ্চিম এলাকার স্থলভূমি, ৮. বোর্নিওর উত্তরাঞ্চল, ৯. ব্রাজিলের আটলান্টিক বনাঞ্চল, ১০. মালয়েশিয়ার উপদ্বীপসমূহ, ১১. মাদাগাস্কারের পূর্বাঞ্চল ও ১২. হিমালয়ের পূর্বাঞ্চল। এসব অঞ্চল মাত্র ২,৯২,০০০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে অবস্থিত।

জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ আঞ্চলিক এলাকা

বিশ্বের বনভূমির আয়তন ৮৩ লাখ ৪০ হাজার বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে ৩৪% এলাকা জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। এসব এলাকার রয়েছে ৩৪,৪০০ আঞ্চলিক প্রজাতির উদ্ভিদ; বিশ্বের যত উদ্ভিদ রয়েছে তার আঞ্চলিক প্রজাতির ২৭% এবং মোট উদ্ভিদ প্রজাতির ১৩%।

পৃথিবীতে জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ দেশের তালিকা করলে দেখা যায়, ব্রাজিল, ইন্দোনেশিয়া, চীন ইত্যাদি বৃহৎ আয়তনের দেশগুলো শীর্ষে। মূলত বৃহদায়তন হওয়ায় এসব দেশে বিচিত্র ভৌগোলিক পরিবেশ বিদ্যমান। ফলে প্রজাতিবৈচিত্র্য বেশি। এক্ষেত্রে ক্ষুদ্র আয়তনের দেশগুলোকে আয়তন অনুসারে বিবেচনা করলে দেখা যায়, ব্রুনেই, গাম্বিয়া, জ্যামাইকাপ্রভৃতি দেশ অতিশয় জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ।

জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ আঞ্চলিক এলাকা

বিশ্বের জীববৈচিত্র্যপূর্ণ দেশসমূহ :

সার্বিক	আয়তন বিবেচনায়
ব্রাজিল	ব্রুনেই
কলম্বিয়া	গাম্বিয়া
ইন্দোনেশিয়া	বেলিজ
চীন	জ্যামাইকা
মেক্সিকো	এল সালভাদর

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – জীবমন্ডল

টপিক – ০৩ বাংলাদেশের বনাঞ্চল

বাংলাদেশের বনাঞ্চল

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বাংলাদেশের বনাঞ্চল

কোনো দেশের স্থান বিশেষে অনেকটা এলাকাজুড়ে যখন ছোট, মাঝারি বা বড় ধরনের বিভিন্ন প্রজাতির অসংখ্য গাছের সমাবেশ ঘটে তখন তাকে বনভূমি বলে। কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে সে দেশের মোট আয়তনের ২৫% বনভূমি থাকা আবশ্যক। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে আছে ১৭.৫০%, যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। দেশের মোট বনভূমির অধিকাংশ খুলনা ও চট্টগ্রাম বিভাগে অবস্থিত।

বনভূমির পরিমাণ ও জনসংখ্যার ঘনত্বের মধ্যেও একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান। মাথাপিছু বনভূমির পরিমাণ (forest per capita) দ্বারা তা নির্দেশ করা হয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায়, বাংলাদেশে মাথাপিছু বনভূমির পরিমাণ অত্যন্ত কম, যা পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এর "Global Forest Resources Assessment" অনুযায়ী বিশ্বের গড় মাথাপিছু বনভূমির পরিমাণ প্রায় ০.৫২ হেক্টর (৫,২০০ বর্গমিটার); আর বাংলাদেশের মাথাপিছু বনভূমির পরিমাণ প্রায় ০.০১২ হেক্টর (১২০ বর্গমিটার) (সূত্র: Bangladesh Forest Information System], যা বিশ্বের গড়ের চেয়ে অনেক কম। বাংলাদেশের মাথাপিছু বনভূমি বিশ্ব গড়ের মাত্র ২.৩ শতাংশ প্রায়। এই পরিস্থিতি থেকে বের হতে হলে বাংলাদেশে বন সংরক্ষণ, সামাজিক বনায়ন, এবং পরিকল্পিত নগরায়ণ খুব জরুরি।

বাংলাদেশের বনাঞ্চল

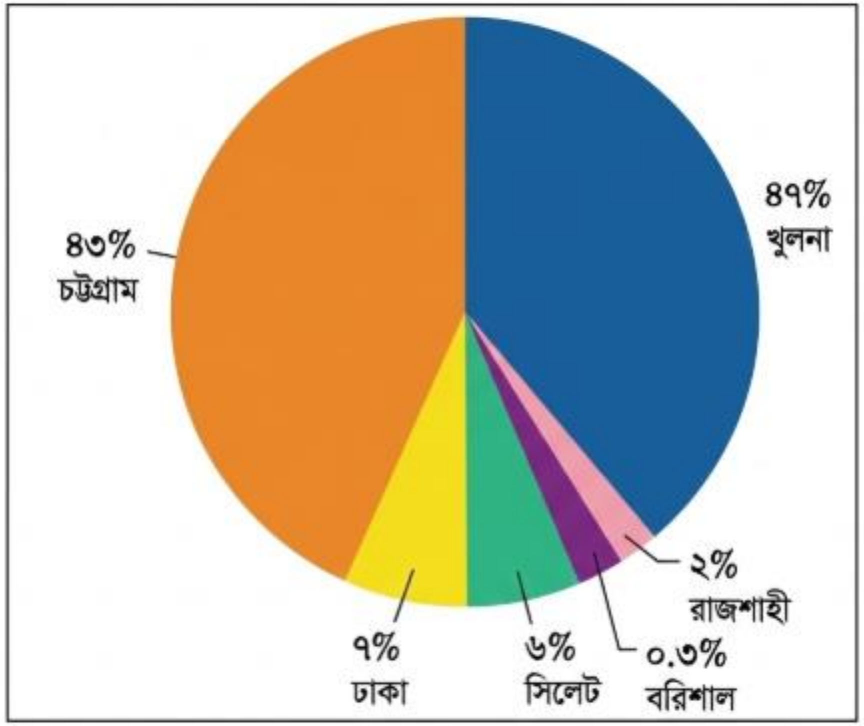

উৎস ঃ বন অধিদপ্তর

চিত্র-৯.১: বিভাগ অনুসারে দেশের বনভূমি ও বন্যজ সম্পদের পরিমাণ

বাংলাদেশের বনজ সম্পদের শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Forest in Bangladesh)

জলবায়ু ও মৃত্তিকার গুণাগুণের তারতম্যের কারণে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের উদ্ভিদ দেখতে পাওয়া যায়। উদ্ভিদগোষ্ঠী অনুসারে বাংলাদেশের বনভূমিকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যথা-

১. ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পতনশীল পত্রযুক্ত বৃক্ষের বনভূমি

২. পতনশীল (পর্ণমোচী) পত্রযুক্ত বৃক্ষের বনভূমি

৩. গরান বা স্রোতজ বনভূমি

বাংলাদেশের বনাঞ্চল

১. ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পতনশীল পত্রযুক্ত বৃক্ষের বনভূমি: বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পূর্বদিকের পাহাড়ি এলাকাসমূহ যেমন- বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলায় এ বনভূমি দেখা যায়। এ বনভূমির আয়তন প্রায় ১৫,৩২৬ বর্গকিলোমিটার। অর্থনৈতিক গুরুত্বঃ এ এলাকায় বনভূমি গড়ে ওঠার কারণগুলো হলো- স্বল্প জনবসতি, অত্যধিক বৃষ্টি (৩০০ সে.মি.-এর বেশি), পরিমিত উত্তাপ (৩৪° সে.), বেলেপাথর ও কর্দমযুক্ত পাহাড়ি মৃত্তিকা।

এ বনভূমিতে পতনশীল পত্রযুক্ত বৃক্ষের মধ্যে কড়ই, সেগুন, গামার, গর্জন, জারুল ও শিমুল উল্লেখযোগ্য; চিরহরিৎ বৃক্ষের মধ্যে ময়না, চাপালিশ ও তেলসুর উল্লেখযোগ্য। বাঁশ, বেত, ইত্যাদিও এ বনে পাওয়া যায়। প্রাণীর মধ্যে বন্যকুকুর, হাতি, সাপ, হরিণ, বাইসন ইত্যাদি প্রাণী ও নানা ধরনের পাখি পাওয়া যায়।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব: এ বনভূমির যথেষ্ট অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। যেমন: কাগজ শিল্পের প্রধান কাঁচামাল বাঁশ এ বন থেকে পাওয়া যায়, গর্জন ও জারুল রেলওয়ের স্লিপার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এ বন থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন জীবজন্তুর শিং, চামড়া ও দাঁতের যথেষ্ট বাণিজ্যিক গুরুত্ব রয়েছে। বেত দ্বারা চেয়ার, টেবিল, শীতল পাটি, চাটাই, মাদুর ইত্যাদি তৈরি হয়। এ বনভূমির ঘাস ও নলখাগড়া সিলেটের কাগজ ও মন্ড কলে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

২. পতনশীল পত্রযুক্ত বৃক্ষের বনভূমি: এ শ্রেণির বনভূমি ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও গাজীপুর জেলায় এবং সামান্য কিছু উত্তরাঞ্চলের রংপুর, দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলায় দেখা যায়। এ বনভূমির আয়তন ১,৭৫০ বর্গকিমি। বনভূমির বেশির ভাগ টাঙ্গাইল, গাজীপুর ও ময়মনসিংহ জেলায় অবস্থিত। প্রচুর বৃষ্টিপাত, পর্যাপ্ত পরিমাণে তাপমাত্রা, লৌহজাত পদার্থমিশ্রিত হলুদ-লাল রঙের বালি, কর্দম ও অআঁটসাঁট মৃত্তিকা ইত্যাদি কারণে এ বনভূমি গড়ে ওঠে।

বাংলাদেশের বনাঞ্চল

N
Rangpur
Rajshahi
Mymensingh
Sylhet
Sal forest
Dhaka
Khulna
Barishal
Chattogram
Hill forest
Sundarbans Mangrove
forest
Coastal forest
40 20 0 40 80
Kilometers

অর্থনৈতিক গুরুত্ব: এ বনভূমির শাল ও গজারি বৃক্ষ ঘরের খুঁটি ও জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। শাল বৃক্ষ বৈদ্যুতিক তারের খুঁটি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়, ঘরবাড়ি নির্মাণেও এ বৃক্ষ ব্যববৃত হয়। টেক্সটাইল ও অন্যান্য মিলে মাড় দেওয়ার কাজে ছাতিম ব্যবহূত হয়। এ বন থেকে প্রাপ্ত বাঁশ ও বেত ঘরবাড়ির প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি তৈরিতে ব্যবধৃত হয়। কুচি বৃক্ষ দ্বারা হাতার বাঁট এবং বাকল দ্বারা ওষুধ তৈরি হয়।

৩. পরান বা স্রোতল বনভূমি: বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে সমুদ্র উপকূলের লবণাক্ত ও জোয়ার-ভাটা প্রভাবিত সুক্ষ নিবাসের উদ্ভিদকে স্রোতজ বনভূমি বলা হয়। এ বনভূমি খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলায় অধিক এবং বরগুনা জেলায় সামান্য পরিমাণ রয়েছে। বাংলাদেশের একক বৃহত্তম এ বনভূমি সুন্দরবন নামে খ্যাত। এ বনভূমির আয়তন ৬,৭৮৬ বর্গকিলোমিটার।

এ বনভূমি গড়ে ওঠার কারণ হলো: প্রচুর বৃষ্টিপাত (২০০-৩০০ সে.মি.), পরিমিত উত্তাপ, বিরল জনবসতি, সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা ও লবণাক্ত পানির প্রভাব।

বাংলাদেশের বনাঞ্চল

সুন্দরী, গরান, গেওয়া, ধুন্দল, কেওড়া, আসুর, বাইন, গোলপাতা, বীণা, পশুর ইত্যাদি এ বনভূমির উল্লেখযোগ্য বৃক্ষ। এ বনভূমিতে হরিণ, বানর, বাঘ, শুকর, কুমির, বনবিড়াল, সাপ ও বিভিন্ন ধরনের পাখি পাওয়া যায়। ম্যানগ্রোভ বনভূমি জীববৈচিত্র্যের জন্য সমৃদ্ধ। UNESCO ১৯৯৭ সালে সুন্দরবনকে ৫২২তম World Heritage (বিশ্ব ঐতিহ্য) হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।
অর্থনৈতিক গুরুত্ব: এ বনভূমির গরান জ্বালানি কাঠ হিসেবে, পেন্সিল তৈরিতে ধুন্দল, গোলপাতা ঘরের চালের ছাউনির কাজে, সুন্দরী বৃক্ষ গৃহ ও নৌকা নির্মাণে এবং বৈদ্যুতিক ও টেলিগ্রামের খুঁটি হিসেবে ব্যবধৃত হয়। গেওয়া কাঠ নিউজপ্রিন্ট কাগজ ও দিয়াশলাই তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এ বন থেকে প্রাপ্ত পশুর চামড়ার বিশ্ববাজারে চাহিদা রয়েছে।
বাংলাদেশের আবহাওয়া ও মৃত্তিকা বনজ সম্পদ বৃদ্ধির অনুকূলে। তবুও আমাদের দেশে যে বনভূমি রয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় কম। অথচ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ হ্রাসে বনভূমি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুন্দরবনসহ দেশের অন্যান্য বনভূমির যথাযথ সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের ওপর নজর দেওয়া তাই সকলের দায়িত্ব।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – জীবমন্ডল

টপিক – ০৪ ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্র

ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্র

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্র

কোনো স্থানের উদ্ভিদ, প্রাণী এবং এদের জড় পরিবেশ নিজেদের মধ্যে এবং পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া-বিক্রিয়া করে অবস্থান করে। জীব ও তার পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফলে এদের গঠন ও কার্যের পরিবর্তন সাধিত হয়ে থাকে। কোনো স্থানের জীব ও এদের পরিবেশ নিজেদের মধ্যে এবং পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া-বিক্রিয়ার গতিময় পদ্ধতিকে ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্র বলে।

চিত্র-৯.৩: একটি পুকুরের ইকোসিস্টেম বা বাস্তুসংস্থান

ইকোসিস্টেমের প্রকারভেদ (Classification of Ecosystem)

ইকোসিস্টেম প্রধানত দু'প্রকার। যথা- ১. প্রাকৃতিক এবং ২. মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট।

১. প্রাকৃতিক ইকোসিস্টেম (Natural Ecosystem): প্রাকৃতিক ইকোসিস্টেম আবার।. স্থলজ (terrestrial) এবং ii. জলজ (aquatic) এই দু'প্রকার। বনাঞ্চল, তৃণভূমি, মরুভূমি ইত্যাদি স্থলজ ইকোসিস্টেমের উদাহরণ। নদী, পুকুর, হ্রদ এগুলো জলজ মিঠা পানির ইকোসিস্টেম। এর মধ্যে পুকুর, হ্রদ হলো আবদ্য পানির ইকোসিস্টেম এবং নদী হলো প্রবাহমান পানির ইকোসিস্টেম। সাগর, মহাসাগর হলো লবণাক্ত পানির ইকোসিস্টেম। মোহনার ইকোসিস্টেম আবার বিভিন্ন ধরনের।

২. মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট ইকোসিস্টেম (Man made Ecosystem); যেসব ইকোসিস্টেম মানুষের তত্ত্বাবধানে চালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় সেসব মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট ইকোসিস্টেম নামে পরিচিত। এগুলোর মধ্যে বিভিন্ন প্রকার শস্যক্ষেত্র, পার্ক, বাগান, ডেইরিফার্ম, পোলট্রিফার্ম এবং পুকুর, হ্রদ, খাল-বিল, মৎস্য চাষ প্রকল্প উল্লেখযোগ্য।

ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্র

ইকোসিস্টেমের উপাদান (Elements of Ecosystem):

গঠনগত দিক থেকে ইকোসিস্টেমের প্রধান উপাদান হচ্ছে দু'টি। যথা- ক. অজীব উপাদান ও খ. সজীব উপাদান। নিম্নে এসব উপাদান একটি হকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো-

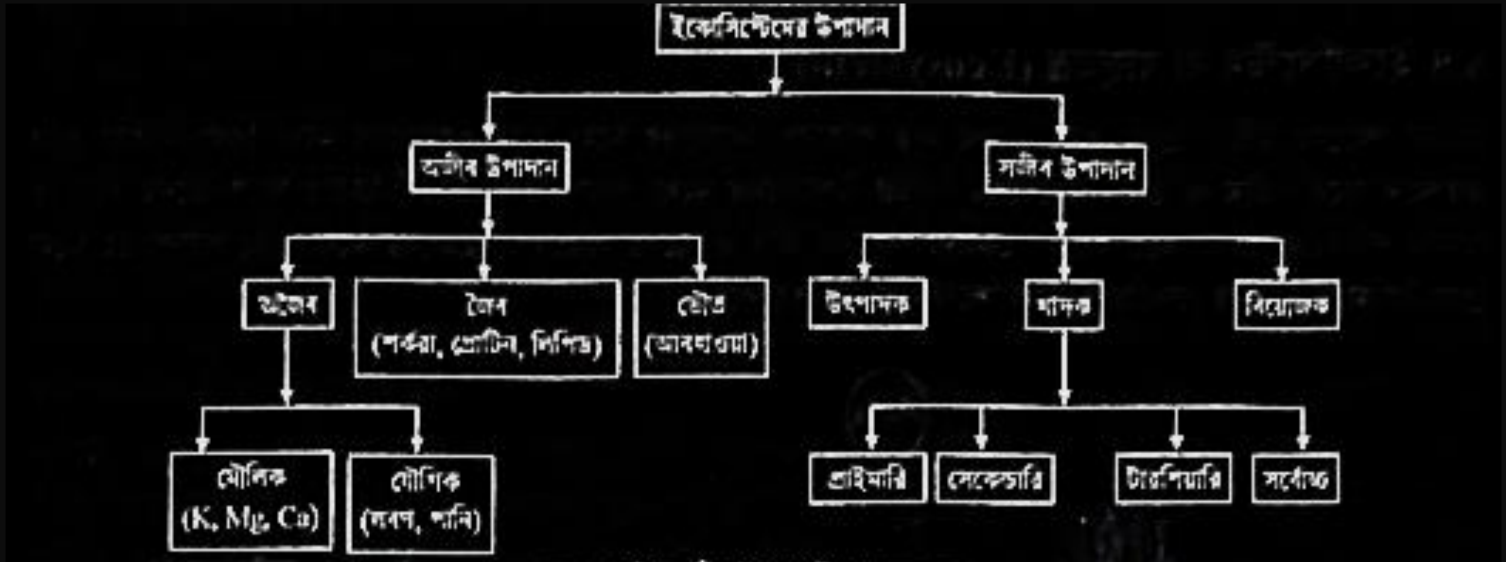

ছক-১: ইকোসিস্টেমের উপাদানসমূহ

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – জীবমন্ডল

টপিক – ০৫ পৃথিবীর প্রধান প্রধান ইকোসিস্টেম

পৃথিবীর প্রধান প্রধান ইকোসিস্টেম

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

পৃথিবীর প্রধান প্রধান ইকোসিস্টেম

পৃথিবীব্যাপী ইকোসিস্টেম বিভিন্ন আকারের হতে পারে। যেমন- পুকুর, হ্রদ, নদী, সাগর, মরুভূমি, বন ইত্যাদি স্থানে নির্দিষ্ট ধরনের ইকোসিস্টেম রয়েছে।

সমুদ্রের ইকোসিস্টেম (Ecosystem of the Ocean/Sea)

সাগর সবচেয়ে বৃহৎ ও সর্বাপেক্ষা স্থিতিশীল ইকোসিস্টেম। ভূপৃষ্ঠে প্রায় ৭০ ভাগ স্থান দখল করে রয়েছে সাগর। এই জলভাগে স্থলভাগ হতে জীবদেহের জন্য প্রায় ৩০০ গুণ বেশি স্থান রয়েছে। অন্যান্য ইকোসিস্টেমের ন্যায় সাগরের জীবকুলও আলোর ওপর নির্ভরশীল।একটি সামুদ্রিক ইকোসিস্টেমে বিভিন্ন ধরনের সজীব উপাদান রয়েছে। যেমন:

ক. উৎপাদক (Producer); উৎপাদকগুলো সকলই স্বভোজী এবং অধিকাংশই ফাইটোপ্লাঙ্কটন। এরা সাগরের পানিতে ততটুকু গভীরতা পর্যন্ত বিস্তৃত যতটুকু পর্যন্ত সূর্যের আলো পৌঁছায়। সাগরে প্রাথমিক উৎপাদনকারীদের মধ্যে প্লাঙ্কটন উদ্ভিদই প্রধান এবং নীলাভ সবুজ, সবুজ, ধূসর ও লাল শৈবাল ইত্যাদি অন্যতম।

পৃথিবীর প্রধান প্রধান ইকোসিস্টেম

খ. খাদক (Consumer); এগুলো পরভোজী এবং জীবন ধারণের জন্য উৎপাদকের ওপর নির্ভরশীল। প্রাথমিক খাদকগুলো তৃণভোজী। যেমন-ক্রাস্টেশিয়ান, মোলাস্ক (ঝিনুক, শামুক), পাকাশী মাছ। গৌণ খাদকের মধ্যে রয়েছে মাংসভোজী মাছ। টারশিয়ারি খাদকের মধ্যে মাংসভোজী মাছ হলো Cod. Haddock, Halibut

গ. বিয়োজক (Decomposer); সাগরের মৃত জীবের একমাত্র বিয়োজক হলো ব্যাকটেরিয়া ও কিছু ঘত্রাক। সাগরের ১ লিটার পানিতে ৫০,০০,০০০ পর্যন্ত ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারে। এসব ব্যাকটেরিয়া জীবের বর্জ্য ভব্য ও মৃতদেহের ওপর ক্রিয়া করে। চরে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় অজৈব দ্রব্য বিমুক্ত করে।

শস্যক্ষেত্রের ইকোসিস্টেম (Ecosystem of Cropland)

শস্যক্ষেত্রের ইকোসিস্টেম মানবসৃষ্ট। একটি শস্যক্ষেত্রের বাস্তুতন্ত্রের পরিবেশ শব্দতির উপাদানগুলো হলো;

জড় উপাদান: যে অঞ্চলে শস্যক্ষেত্রটি আছে সেখানকার জলবায়ুগত অবস্থা ও মাটির খনিজ পদার্থ (C. II, O, N, P, K) ও পরিবেশ নিয়ে জড় উপাদান। এরূপ জমিতে মানুষ সার দিয়ে শস্য চাষ করে।

সজীব উপাধান: শস্যক্ষেত্রে নানান ধরনের সজীব উপাদান রয়েছে। এগুলোর বর্ণনা নিম্নরূপ-

ক. উৎপাদক: যে শস্যের চাষ করা হয় সেই উদ্ভিদই শস্যক্ষেত্রের প্রাথমিক উৎপাদক। এছাড়াও অনেক গুন্ম জন্মে। কাজেই শস্য ও এসব আগাযাগুলো শস্যক্ষেত্রের প্রাথমিক উৎপাদক।

খ. খাদক: খাদকের মধ্যে বড় ছোট তৃণভোজী প্রাণীও আছে। তৃণভোজীরা হলো- এফিড, থ্রিপস, বিটল ইত্যাদি এবং বড় তৃণভোজীর মধ্যে রয়েছে ইঁদুর, পাখি, গবাদিপশু ও মানুষ। এগুলো প্রাথমিক খাদক। গৌণ খাদকের মধ্যে রয়েছে প্রথম স্তরের মাংসাশী প্রাণী যেমন- ব্যাঙ, পাখি যারা পোকামাকড় খেয়ে বাঁচে।টারশিয়ারি খাদকের মধ্যে সেসব মাংসাশী প্রাণীকে বোকায়, যারা প্রথম স্তরের মাংসাশী প্রাণীর ওপর নির্ভরশীল যেমন- সাপ, বাজপাখি, ব্যাঙ ও ছোট পাখি।

গ. বিয়োজক: মাটি ও বায়ুর অণুজীব যারা মৃতদেষ বিয়োজিত করে জৈব পদার্থে পরিণত করে তাদেরকে বিয়োজক বলে। এরা প্রধানত ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও অ্যাকটিনোমাইসেটিস। এরা মৃত জীবদেহ পচিয়ে বিজারিত করে।

অরণ্যের ইকোসিস্টেম (Ecosystem of Forest)

পৃথিবীর ৪০ ভাগ এলাকা জুড়ে বন বা অরণ্য রয়েছে। যেসব এলাকার ব্যয়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বেশি কিন্তু তাপমাত্রা বেশি নয় সেই ধরনের এলাকা অরণ্য দ্বারা আবৃত। পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় জলবায়ুর ওপর নির্ভর কয়ে বিভিন্ন ধরনের অরণা সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রত্যেক অরণ্যে নির্দিষ্ট ধরনের উড্ডিদ ও প্রাণী রয়েছে। নিম্নে একটি অরণ্যের

ইকোসিস্টেমের বর্ণনা দেওয়া হলো:

অজীব উপাদান: অজীব উপাদান বলতে প্রধানত আলো, বাতাস, উত্তাপ, পানি ও মাটিকে বোঝায়। বনাঞ্চলের অবস্থাভেদে আলো ও তাপের প্রাপ্যতার মধ্যে লক্ষণীয় পার্থক্য ঘটে। তবে মাটিতে পর্যাপ্ত হিউমাস রয়েছে বলে উড্ভিদের বৃদ্ধি সহজে ঘটে এবং বন সৃষ্টিও সহজতর হয়। বায়ু ও পানির মাধ্যমেও উড্ভিদের বংশ বৃদ্ধি ঘটে থাকে।

পৃথিবীর প্রধান প্রধান ইকোসিস্টেম

জীব উপাদান: জীব উপাদান তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- উৎপাদক, খাদক ও বিয়োজক।

ক. উৎপাদক: উদ্ভিদই বনের উৎপাদনকারী। বনাঞ্চলের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে উদ্ভিদরাজি ভিন্নতর হয়। যেমন-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনাঞ্চলের উদ্ভিদগুলোর (গর্জন) পাতা বড় হয়। আবার নাতিশীতোষ্ণ বনাঞ্চলের পাতাগুলো সূচেয় মতো হয় এবং শুকনো মৌসুমে পাতা (গামার) করে যায়। যেহেতু গ্রীষ্মমণ্ডলীয় উদ্ভিদের পাতা বড় বড় হয় সেহেতু এদের নিচে বাঁশ, ফার্ন এবং গুল্ম জাতীয় ছায়া উদ্ভিদ জন্মে।

খ. খাদক: এদের সবাই শাকাশী এবং এরা উৎপাদকের পাতা খেয়ে বাঁচে।

i. প্রাথমিক খাদক: পিঁপড়া, মাছি, গুবরে পোকা, মাকড়সা, ছারপোকা, পাতা ফড়িং ইত্যাদি। এছাড়াও রয়েছে অন্যান্য প্রাণী যেমন- হাতি, হরিণ, বন্যগরু ইত্যাদি।

ii. গৌণ খাদক: শৃগাল, সাপ, পাখি ও অন্যান্য মাংসাশী প্রাণী।

iii. টারশিয়ারি খাদক: সিংহ, বাঘ, হায়েনা ইত্যাদি।

গ. বিয়োজক: ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক প্রধান বিয়োজক হিসেবে গচন ঘটিয়ে আবর্জনা পরিষ্কার করে এবং সাথে সাথে উৎপাদক ও খাদকের মৃতদেহের জটিল জৈব পদার্থ সরল অজৈব পদার্থে রূপান্তরের মাধ্যমে পুনরায় মাটিতে ফিরিয়ে দেয়। বিয়োজক ছত্রাকের মধ্যে রয়েছে Aspergillus, Coprimus. Polyporus, Fusarium কতিপয় প্রাণীও পরোক্ষভাবে পচনে সাহায্য করে এবং এদের মধ্যে রয়েছে প্রোটোজোয়া, নেমাটোডা, এনেলিডা, মিলিপেড, সেন্টিপেড ইত্যাদি।

তৃণক্ষেত্রের ইকোসিস্টেম (Ecosystem of Grassland)

পৃথিবীর প্রায় শতকরা নয় ভাগ এলাকা তৃণ দ্বারা আবৃত। যেসব এলাকায় বার্ষিক ২৫-৭৫ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয় সেসব স্থানে প্রচুর ঘাস জন্মে। পৃথিবীর প্রধান প্রধান তৃণক্ষেত্রের ইকোসিস্টেমের মধ্যে কানাডার বিস্তৃত সমতলভূমি, যুক্তরাষ্ট্রী, দক্ষিণ আর্জেন্টিনা যতে প্রাজিল এবং দক্ষিণ এশিয়া হতে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত এলাকা ইত্যাদি প্রধান। তৃণক্ষেত্রের ইকোসিস্টেমের উপাদানগুলোকে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে:

জড় উপাদান: এর মধ্যে রয়েছে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, সালফার ইত্যাদি, যা উদ্ভিদের জৈবিক ক্রিয়ার জন্য প্রয়োজন হয় এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড, পানি, নাইট্রেট, ফসফেট ইত্যাদি। এছাড়া উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় পটাসিয়াম, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, দৌৎ ইত্যাদি সব ধরনের খনিজ পদার্থ মাটিতে বিদ্যমান থাকে।

তৃণক্ষেত্রের ইকোসিস্টেমের উপাদানগুলোকে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে:

জড় উপাদান: এর মধ্যে রয়েছে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, সালফার ইত্যাদি, যা উদ্ভিদের জৈবিক ক্রিয়ার জন্য প্রয়োজন হয় এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড, পানি, নাইট্রেট, ফসফেট ইত্যাদি। এছাড়া উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় পটাসিয়াম, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, লৌহ ইত্যাদি সব ধরনের খনিজ পদার্থ মাটিতে বিদ্যমান থাকে।

সজীব উপাদান: একটি তৃণক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সজীব উপাদান থাকে। এগুলোর বর্ণনা দেওয়া হলো:

ক. প্রাথমিক উৎপাদকঃ এদের মধ্যে Gramineae, Cyperaceae গোত্রের উদ্ভিদই প্রধান; যেমন-Dichanthium, Cynodon, Desmodium, Setaria ইত্যাদি। তাছাড়া কিছু গুল্ম ও বীরুৎ প্রাথমিক উৎপাদক হিসেবে দেখা যায়।

খ. খাদক: মুখ্য খাদক বলতে তৃণভোজী জীবজন্তুকে বোঝায়। যেমন- গরু, বাছুর, ছাগল, ভেড়া, হরিণ, মেষ, শুশুক, ইঁদুর ইত্যাদি। গৌণ খাদকের মধ্যে সেসব মাংসাশী প্রাণীকে বোঝায় যারা মুখ্য খাদকের ওপর নির্ভরশীল, যেমন- শিয়াল, সাপ, ব্যাঙ, টিকটিকি, পাখি ইত্যাদি।

গ. বিয়োজক: বিভিন্ন প্রকার পরভোজী ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া ও অ্যাকটিনোমাইসেটিস বিয়োজক হিসেবে উল্লেখ করা যায়। ছত্রাকের মধ্যে রয়েছে Mucor, Penicillium, Aspergillus, Rhizopus ইত্যাদি। এরা মৃত উৎপাদক ও খাদকের দেহের জটিল জৈব পদার্থের পচন ঘটিয়ে সরল পদার্থে পরিণত করে। যার ফলে বিভিন্ন ধরনের খনিজ পদার্থ মাটিতে ফিরে আসে এবং উৎপাদকের জন্য গ্রহণযোগ্য হয়।

মরুভূমির ইকোসিস্টেম (Ecosystem of Desert)

পৃথিবীর শতকরা ১৭ ভাগ এলাকা মরুভূমির অন্তর্গত। এসব এলাকায় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৫ সে.মি. এর কম। এরূপ ইকোসিস্টেমেও প্রজাতিবৈচিত্র্য রয়েছে। এখানে প্রচণ্ড গরম ও পানির অভাব লক্ষণীয়। মরুভূমির ইকোসিস্টেমকে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা যায়:

মরুভূমির ইকোসিস্টেমে বিভিন্ন রকমের সজীব উপাদান রয়েছে।

ক. উৎপাদক: গুল্ম, ঝোপ, ক্যাকটাস, মস, লাইকেন, কিছু সায়ানোব্যাকটেরিয়া, ব্রিটল বুস ইত্যাদি অন্যতম। এসব উদ্ভিদের মূল বহু শাখা-প্রশাখাযুক্ত এবং মাটির সামান্য নিচে থাকে। যার ফলে এরা কিছু বৃষ্টিপাত হলেই পানি গ্রহণ করতে পারে। অল্প কিছু মরুজ উদ্ভিদের পাতাগুলো সুঁচের আকার হয়, এতে এদের প্রস্বেদনের হার হ্রাস পায়। এছাড়া ক্যাকটাস জাতীয় উদ্ভিদের কাণ্ড রসালো থাকে যাতে এরা পর্যাপ্ত পানি জমা রাখে এবং প্রয়োজনের সময় এই পানি দ্বারা জৈবিক ক্রিয়া চালিয়ে যায়।

পৃথিবীর প্রধান প্রধান ইকোসিস্টেম

খ. খাদক: এই পরিবেশে উৎপাদকের সংখ্যা খুবই কম। ফলে এদের ওপর নির্ভরশীল খাদকের সংখ্যাও কম হয়। মরু খাদকের মধ্যে রয়েছে সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী, কীট-পতঙ্গ, নৈশ রোডেন্ট, উট। গাছপালার কচি অংশ খেয়ে জীবন ধারণ করে, এরূপ প্রাণী এ অঞ্চলে দেখা যায়।

গ. বিয়োজক: মরুভূমিতে বিয়োজকের সংখ্যা খুবই অল্প থাকে। সেজন্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃতদেহ পচে হিউমাস তৈরি না হয়ে অত্যধিক তাপে এগুলো শুকিয়ে যায়। এজন্য মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পেতে পারে না।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – জীবমন্ডল

টপিক – ০৬ বায়োম

বায়োম

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বায়োম

জীবের সাথে জীবের, জীবের সাথে জড় এবং পরিবেশের বিভিন্ন দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান উপাদানের মধ্যে সবসময় আন্তঃক্রিয়া পরিচালিত হয়। এ আন্তঃক্রিয়ার ফলে যে উদ্ভিদ বা প্রাণী সে স্থানের জন্য উপযুক্ত সেই উদ্ভিদ বা প্রাণী সেখানেই জন্মাবে। জীবের সাথে জড় মাধ্যম ও পরিবেশের এই আন্তঃক্রিয়া বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেম নামে পরিচিত। ইকোসিস্টেমকে যখন বিশ্বমাত্রায় (সুনির্দিষ্ট অঞ্চলে) প্রকাশ করা হয় তখন একে বায়োম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। প্রতিটি বায়োমের সাধারণ প্রকৃতি ও বিস্তৃতি নির্ভর করে বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, মাটির বৈশিষ্ট্য, পরিবেশীয় বাধা (যেমন-পর্বত, সাগর-মহাসাগর, বড় হ্রদ, মরুভূমি প্রভৃতি) ইত্যাদির ওপর। প্রধানত ভূমিরূপ, জলবায়ু ও প্রধান উদ্ভিজ্জ মিলিতভাবে এক একটি বায়োম সুনির্দিষ্ট করে থাকে। অতএব বলা যায় যে, নির্দিষ্ট পরিবেশ ও জলবায়ুর প্রভাবে বিশেষ ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণীর সমন্বয়ে গড়ে ওঠা জীবমণ্ডলের বৃহৎ ভৌগোলিক এককেকেই বায়োম বলে। বায়োম জীবমণ্ডলের সর্ববৃহৎ একক। পরিবেশের সাথে কোনো এলাকায় বিদ্যমান জীবসম্প্রদায়ের আন্তঃক্রিয়ার ফলে বায়োম প্রতিষ্ঠা লাভকরে। বায়োমকে তাই বলা যেতে পারে একটি বায়োটিক কমিউনিটি (Biotic community), যাতে উদ্ভিদ ও প্রাণী সাড়াদানকারী (active) একক হিসেবে কাজ করে।

বায়োম

স্থলজ বায়োম (Land Biome)

যেসব বায়োম স্থলভাগে অবস্থিত এবং প্রচুর উদ্ভিজ্জ সমৃদ্ধ তাকে স্থলজ বায়োম বলে। জলবায়ু, উদ্ভিজ্জ এবং অবস্থানের ভিত্তিতে স্থলজ বায়োম নির্দিষ্ট বা চিহ্নিত করা যায়। যেমন-

তুন্দ্রা বায়োম (Tundra Biome)

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উত্তরের, বৃক্ষহীন এবং শীতলতম স্থান নিয়ে গঠিত বায়োমকে তুন্দ্রা বায়োম বলে। সাইবেরিয়ার উত্তরাংশ, গ্রিনল্যান্ড, আলাস্কা ও উত্তর মেরু অঞ্চল নিয়ে এ বায়োম গঠিত। পরিবেশ: চরম শীত ও ঠান্ডা আবহাওয়ার কারণে বছরের দীর্ঘ সময় বরফে ঢাকা থাকে। ৬-৮ সপ্তাহ গ্রীষ্মকাল এবং তখন উপরের কিছু বরফ গলে ছোট ছোট জলাভূমির সৃষ্টি হয়। বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ১৫ সে.মি. যা বরফ হিসেবে পড়ে। উদ্ভিদের জীবন অতি সংক্ষিপ্ত। জীবের মৃতদেহ এখানে পুষ্টির প্রধান উৎস (নাইট্রোজেন ও ফসফরাস)। তুন্দ্রা বায়োম ২টি অংশে বিভক্ত যেমন- উত্তর মেরু (Arctic) তুন্দ্রা এবং আলপাইন (Alpine) তুন্দ্রা।

বায়োম

উদ্ভিদ: জীববৈচিত্র্য অত্যন্ত কম। এই অঞ্চলের প্রধান উদ্ভিদ মস এবং লাইকেন। এছাড়া রয়েছে কয়েক প্রকার ছোট গুল্ম এবং বৃক্ষ।

প্রাণী: এখানে প্রাণী খুব কম। বেশি ঠান্ডার জন্য উভচর, সরীসৃপ ও মাছ নাই অথবা খুব কম। এখানে প্রধানত উষ্ণ রক্তের স্তন্যপায়ী এবং গ্রীষ্মকালে কিছু যাযাবর পাখি দেখা যায়। স্তন্যপায়ীর মধ্যে বলগা হরিণ, খরগোশ, খেকশিয়াল, ভাল্লুক, কার্বো প্রধান। পাখিদের মধ্যে পেঙ্গুইন, লুনা, হাঁস, বাজপাখি, জিগার, স্যান্ড পাইপার, পেঁচা প্রধান। গ্রীষ্মকালে কিছু মশা ও মাছির আগমন ঘটে। অমেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে শামুক, জোঁক, জলজ বিটল ও মিজ লার্ভা উল্লেখযোগ্য।

প্রাণিদেহ (শ্বেতভল্লুক) লম্বা ও ঘন লোমে আবৃত। চামড়ার নিচে ৬" পুরু চর্বির স্তর থাকে এবং প্রায় সব প্রাণীর রক্ত সাদা।

তৃণভূমির বায়োম (Grassland Biome)
পৃথিবীর যে অঞ্চলে প্রধানত ঘাস জন্মে কিন্তু বড় গুল্ম বা বৃক্ষ জন্মে না তেমন এলাকা নিয়ে তৃণভূমির বায়োম গঠিত। মহাদেশীয় ভূখন্ডের পূর্বাংশে তৃণভূমির বায়োম দেখা যায়। যেমন- আমেরিকার প্রেইরি, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং রাশিয়ার দক্ষিণাংশ।
পরিবেশ: এখানে বার্ষিক ২৫-৭৫ সে.মি. বৃষ্টিপাত হয়। সে কারণে বৃক্ষের সমরোহ নেই, আবার মরুভূমিও নেই। মাটি হিউমাসসমৃদ্ধ, দিনে ও রাতে তাপমাত্রা কম-বেশি হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। শীতে তাপমাত্রা ১৫° সে. এ নেমে যায় আর গ্রীষ্মকালে ৩২° সে. এর উপরে ওঠে। কোনো কোনো বিজ্ঞানী তৃণভূমির বায়োমকে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় সাভানা (Tropical savannas) এবং শীতপ্রধান তৃণভূমি (Temperate grassland) নামক ২টি অঞ্চলে বিভক্ত করেন।
উদ্ভিদ: ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ এ অঞ্চলের প্রধান উদ্ভিদ। বড় ঘাস ১২ থেকে ১৫ সে.মি. লম্বা হয়। এরা গুচ্ছাকারে জন্মায়। যব, গম, রাই, ভালো জন্মে। বৃক্ষ ও গুল্ম অনুপস্থিত। মধ্যপ্রাচ্য ও সাহারায় অতিমাত্রায় পশু চারণের ফলে বর্তমানে ভূমি তৃণশূন্য।

বনভূমির বায়োম (Forest Biome)

পৃথিবীপৃষ্ঠের এক তৃতীয়াংশ বনভূমি দ্বারা আবৃত। বৃষ্টিবহুল এলাকা হওয়ায় এখানে প্রধান জীবগোষ্ঠী হলো বৃক্ষ এবং অন্যান্য কাষ্ঠল উদ্ভিদ। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এমনকি একই দেশে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বনভূমি দেখা যায়। নিচে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় মৌসুমি বনাঞ্চল বায়োম তুলে ধরা হলো।

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় মৌসুমি বনাঞ্চল: আমাজান নদীর অববাহিকায় সবচেয়ে বড় এবং ইন্দোনেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জে ২য় বৃহত্তম বনভূমি দুটি অবস্থিত। এছাড়া আফ্রিকা, ভারত, বার্মা, মধ্য আমেরিকা ও ফিলিপাইনে এ জাতীয় বনাঞ্চল রয়েছে।

পরিবেশ: এখানকার তাপমাত্রা গড়ে ২০০-২৫০ সে.। এখানকার বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ২৫০-৪৫০ সে.মি. যা সারা বছরই হয় তবে বর্ষাকালে অপেক্ষাকৃত বেশি। সে কারণে মাটি ভেজা ও স্যাঁতসেতে থাকে। চিরসবুজ বড় বড় বৃক্ষ থাকায় বনের তলদেশ অন্ধকার ও ঠান্ডা। মাটি অম্লীয় ও তাতে পুষ্টি কম।

বায়োম

উদ্ভিদ: বিভিন্ন ধরনের উচ্চ বৃক্ষ প্রজাতির উদ্ভিদ এখানে জন্মে এবং একক কোনো প্রজাতি আধিপত্য বিস্তার করে না। এমন বনে সাধারণত প্রজাতিবৈচিত্র্য বেশি। অধিকাংশই চিরসবুজ তবে বিচ্ছিন্ন কিছু পর্ণমোচী বৃক্ষ জন্মে। বৃক্ষগুলো ২-৩ স্তরে চাঁদোয়া (Canopy) গঠন করে। বৃক্ষের সাথে অনেক কাষ্ঠল লতা এবং পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ জন্মে। এছাড়া, ফার্ন, মস ও তাল জাতীয় গাছ জন্মে।

প্রাণী: এই বন প্রাণিবৈচিত্র্যেও সমৃদ্ধ। বানর, পাখি, সরীসৃপ, উভচর প্রাণী, শামুক, জোঁক, বিছা, মথ, পিঁপড়া, উইপোকাসহ নানা প্রকার পতঙ্গ উল্লেখযোগ্য।

মরুভূমির বায়োম (Desert Biome)

মরুভূমি হলো এমন ভৌগোলিক অঞ্চল যেখানে বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ৫০ সে. মি. এর কম এবং বাষ্পায়ন বৃষ্টিপাতের চেয়ে বেশি। সবচেয়ে বড় মরুভূমি সাহারা যা আফ্রিকায় অবস্থিত। এছাড়া অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়াও বৃহৎ বালুকাময় মরুভূমি। চীন-রাশিয়া-মঙ্গোলিয়ার গোবি মরুভূমি, সৌদি আরবের রাব-আল-খালি মরুভূমি, আফ্রিকার কালাহারি, ভারতের থর, চিলির আতাকামা, যুক্তরাষ্ট্রের নেভাদা অন্যান্য প্রসিদ্ধ মরুভূমি। মরুভূমিগুলোকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

যেমন- (i) উষ্ণ ও শুষ্ক (ii) অনুর্বর (iii) উপকূলীয় এবং (iv) ঠান্ডা। তবে এখানে উষ্ণ মরুভূমিই আলোচ্য।

পরিবেশ: এটা অতি উত্তপ্ত অঞ্চল যেখানে স্থায়ী বা সাময়িক প্রবাহিত কোনো জলাশয় নেই। বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ২৫ সে.মি. এর কম। দিন ও রাতের তাপমাত্রা ৩০° সে. পর্যন্ত পার্থক্য হতে পারে। কারণ এখানে বাতাসে জলীয়বাষ্প নেই। মাটিতে জৈব পুষ্টি খুব কম বা অনুপস্থিত। উপরন্তু মাটিতে কোথাও প্রচুর পুষ্টি থাকলেও সর্বত্রই পানির খুব অভাব।

বায়োম

উদ্ভিদ: মরুভূমিতে বর্ষজীবী ও বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ জন্মে। বর্ষজীবী উদ্ভিদের জীবনকাল খুব সীমিত আর বহু বর্ষজীবী উদ্ভিদগুলোর পানির অপচয় রোধে ব্যবস্থা আছে। এদের বৃদ্ধিও খুব কম। এসব এলাকার প্রধান উদ্ভিদ হলো ক্যাকটাস, কিছু ইউফররিয়া, কিছু কম্পোজিট ও লিগুম, বাবলা ও খেজুর জাতীয় গাছ।

প্রাণী: মরুভূমিতে প্রাণীর সংখ্যা কম হলেও বিচিত্র ধরনের যেমন- স্তন্যপায়ীদের মধ্যে উট, দুম্বা, জ্যাক, র‍্যাবিট, ক্যাঙ্গারু, ইঁদুর, খেকশিয়াল প্রধান; সরীসৃপ মরুভূমিতে সমৃদ্ধ যেমন- হর্ন লিজার্ড, গিলা মনস্টার, কোরাল সাপ ইত্যাদি; পাখিদের মধ্যে টাকি, শকুন, দাড়কাক, মধু পাখি উল্লেখযোগ্য। মরুভূমির প্রাণীরা রাত্রিতে বেশি চলাচল করে।

সাভানা বায়োম (Savanna Biome)

ক্রান্তীয় তৃণভূমির নাম সাভানা। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ক্রান্তীয় তৃণভূমি বিভিন্ন নামে পরিচিত। আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং ভারতে সাভানা রয়েছে। মধ্য আফ্রিকায় সবচেয়ে বড় সাভানা রয়েছে (৫ মিলিয়ন বর্গ মাইল)।

পরিবেশ: সাভানায় শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকাল দেখা যায়। এখানে কম বৃষ্টিযুক্ত দীর্ঘ গ্রীষ্মকাল বিরাজ করে। বছরে ৫০-১২৭সে.মি. বৃষ্টিপাত হয় এবং জলবায়ু উষ্ণ। বছরে প্রায় ৬-৮ মাস ধরে বৃষ্টিপাত চলে। মাটিতে পাতলা হিউমাস থাকে। মৃত্তিকা ব্যাপক ছিদ্রযুক্ত তাই বৃষ্টির পানি সহজেই নিচে চলে যায়।

উদ্ভিদ: সাভানা এক প্রকার তৃণভূমি হলেও এর মাঝে মাঝে বৃক্ষ বা ঝোপ জাতীয় গাছ থাকে। এইসব অঞ্চলে ঘাসের সাথে বাবলা, ইউফরবিয়া এবং কিছু তাল জাতীয় উদ্ভিদ দেখা যায়। মৌসুমি বজ্রপাত থেকে সৃষ্ট আগুন (দাবানল) এ অঞ্চলে উদ্ভিদের প্রজাতি বৈচিত্র্য নিয়ন্ত্রণে বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাণী: নানা প্রকার এন্টিলোপ, জেব্রা, জিরাফ, ক্যাঙ্গারু, মহিষ, সিংহ, চিতাবাঘ, হায়েনা, হাতি প্রধান। এছাড়াও ছোট প্রাণীর মধ্যে সাপ, ইঁদুর, কাঠবিড়াল, উই, গুবরে পোকা প্রধান।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – জীবমন্ডল

টপিক – ০৭ জলজ বায়োম

জলজ বায়োম

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

জলজ বায়োম

স্থলভাগের বাইরে অর্থাৎ পৃথিবীপৃষ্ঠের জলময় বিন্যাসের বায়োমগুলোকে একত্রে জলজ বায়োম বলে। পানিতে দ্রবীভূত উপাদানের (লবণ) ঘনত্বের ওপর ভিত্তি করে জলজ বায়োম প্রধানত দুই প্রকার। যথা- মিঠা ও লবণাক্ত পানির বায়োম। বিভিন্ন প্রকার জলজ বায়োমগুলো হলো-

হ্রদ ও পুকুরের বায়োম (Biome of Lake and Ponds)

এমন জলাশয়ের আয়তন কয়েক মিটার থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত। এদের গভীরতায়ও ব্যাপক পার্থক্য আছে। অনেক পুকুর বর্ষাকালে শুকিয়ে যায়। হ্রদের গভীরতা ব্যাপক (বৈকাল হ্রদ ৪৭৪২ ফুট) এবং তা স্থায়ী জলাধার। যেহেতু অন্যান্য জলাশয় থেকে হ্রদ ও পুকুর বিচ্ছিন্ন তাই এদের জীববৈচিত্র্য সীমিত। গভীর পুকুর এবং হ্রদগুলোতে আনুভূমিক অঞ্চল থাকে। যেমন-

I. লিটোরাল অঞ্চল: এটা হ্রদের কিনারার উষ্ণ অঞ্চল। এখানে বিভিন্ন প্রকার শৈবাল, মূলাবদ্ধ ও ভাসমান উদ্ভিদ জন্মে। প্রাণীদের মধ্যে স্নেইল, ক্লামস, পতা, ক্রিস্টাশিয়ান, মাছ এবং উভচর থাকে। পতক্তোর মধ্যে ড্রাগন ফ্লাই এবং মিজেস প্রধান। এখানকার উদ্ভিদ ও প্রাণীগুলো ডাহুক, সাপ ও কচ্ছপের খাদ্য।

জলজ বায়োম

II. লিমনেটিক অঞ্চল: হ্রদের উপরের মুক্ত অঞ্চলকে লিমনেটিক অঞ্চল বলে। এই অঞ্চল আলোকিত এবং এখানে প্রধানত ফাইটোপ্লাঙ্কটন ও জুওপ্লাঙ্কটন থাকে। এছাড়া বেশ কিছু ক্ষুদ্রাকার মাছ এখানে থাকে। প্লাঙ্কটনের কারণে এ অঞ্চলটি খাদ্য শৃংখলে (Food chain) বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

iii. প্রোফান্ড অঞ্চল: হ্রদের নিচে ক্ষীণ আলোকিত অঞ্চলকে বোঝায়। এই অঞ্চলের পানি ঠান্ডা এবং বেশি ঘন। এখানকার প্রাণীগুলো পরভোজী প্রকৃতির। এরা মৃতদেহ ভক্ষণ করে।

হ্রদ ও পুকুরের পানির তাপমাত্রা বিভিন্ন ঋতুতে কমবেশি হয়। গ্রীষ্মকালে পৃষ্ঠদেশে ২২° সে. অথচ তলদেশে ৪° সে. হতে পারে। আবার শীতকালে পৃষ্ঠদেশে ০° সে. (বরফ) হতে পারে। উপর ও তলদেশের মাঝে থার্মোক্রাইন নামে একটি স্তর আছে যেখানে তাপমাত্রা দ্রুত পরিবর্তন হয়। কোনো কোনো হ্রদে বছরে এক বা একাধিক বার উপর ও নিচের পানির মিশ্রণ ঘটে।

মহাসাগর ও সাগরের বায়োম (Biome of Ocean and Sea)

মহাসাগর, সাগর, মোহনা মিলে পৃথিবী পৃষ্ঠের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ ভাগ স্থান দখল করে আছে। এজন্য এটাই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বায়োম এবং ইকোসিস্টেম। সাগরের লবণাক্ততা প্রায় ৩৫ পিপিএম এবং pH মান সাধারণত ৪। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে পৃষ্ঠতলে পানির তাপমাত্রা ২৭০ সে. ও মেরু অঞ্চলে ৩° সে.। পৃষ্ঠতলের তুলনায় তলদেশে পানির চাপ সহস্র গুণ বেশি। তাই উপরের স্তরের অনেক জীবই নিচের স্তরে বাঁচে না। নিচের স্তরে (সাগরের তলদেশে) ভিন্নমাত্রার জীববৈচিত্র্য দেখা যায়। মোট কথা সমুদ্রের পানিরাশিতে ব্যাপক জীববৈচিত্র্য বিদ্যমান।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স
ভূগোল ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – জীবমন্ডল

টপিক – ০৮ বাংলাদেশের বায়োম

বাংলাদেশের বায়োম

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশের বায়োম

বাংলাদেশে সাধারণত স্থলজ বায়োম দেখা যায়। বৃষ্টিবহুল এলাকা হওয়ায় প্রধান জীবগোষ্ঠী হলো বৃক্ষ এবং অন্যান্য কাষ্ঠল উদ্ভিজ।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ একই রকম বাৎসরিক তাপমাত্রাযুক্ত (৩০°C) আর্দ্র গ্রীষ্মমণ্ডলীয়। উত্তর অংশে তাপমাত্রার উঠানামা লক্ষণীয়। এখানে শরৎ ও শীতকালের তাপমাত্রা ১০০-২০০০ এর মধ্যে থাকে, বসন্তে বেড়ে পশ্চিম ও পূর্বাংশে গ্রীষ্মে ৩০০০ ছাড়িয়ে যায়। শীতকাল শুষ্ক কিন্তু গ্রীষ্ম আর্দ্র। দক্ষিণ অংশে গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতু থাকলেও তা সুস্পষ্ট বিভেদিত নয়। পার্বত্য এলাকায় আবহাওয়া সিক্ত ধরনের।

বাংলাদেশের বায়োম

পরিবেশ: এ অঞ্চলের ভূমিরূপ বা ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, নদী-নালা, পাহাড় পর্বত ইত্যাদি অজীব পদার্থের সমন্বয়ে তৈরি। এ অঞ্চলের ভৌগোলিক প্রকৃতি এবং এই প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবে অবস্থানরত উদ্ভিদকুল এবং প্রাণীকুলকে নিয়ে গড়ে ওঠে এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ। এখানকার তাপমাত্রা গড়ে ২০-২৫° সেলসিয়াস। এখানকার বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২৫০-৪৫০ সে.মি., তবে বর্ষাকালে অপেক্ষাকৃত বেশি। সে কারণে এ ঋতুতে মাটি ভেজা ও স্যাঁতসেতে থাকে।

পলি দিয়ে এ অঞ্চলের মাটি গঠিত, কাজেই মাটি বেশ উর্বর। বর্ষার সময় এ অঞ্চলের অধিকাংশ এলাকা বর্ষার পানিতে প্লাবিত হয়, ফলে প্রচুর জলজ উদ্ভিদের জন্ম ও বিস্তার ঘটে। বর্ষার শেষে অনেক জলজ উদ্ভিদ পচে জৈব সারে পরিণত হয় এবং মাটিকে উর্বর করে। হাওর, বাঁওড় ও বিল অঞ্চলে বছরের বেশির ভাগ সময়ই পানি থাকে। তবে শীতকালে পানি কমে যায় এবং বিস্তৃত এলাকায় সাধারণত ধান চাষ হয়।

এখানকার উচ্চভূমির মাটি অনুর্বর, অম্লীয় এবং লাল, কোথাও কোথাও ধূসর (সোপানভূমিতে) বর্ণের। বৃষ্টিপাত অপর্যাপ্ত, বছরে ২০০০ মি.মি. এর কম। আবহাওয়া কিছুটা চরমভাবাপন্ন। গ্রীষ্মের উচ্চ তাপমাত্রা, শুষ্ক শীতকাল, বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ কম ইত্যাদি এখানকার পরিবেশীয় বৈশিষ্ট্য।

বাংলাদেশের বায়োম

খাড়ি অঞ্চল জুড়ে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল এ অঞ্চলের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন এ অঞ্চলে অবস্থিত। এ এলাকার মাটি লবণাক্ত, কর্দমাক্ত ও জলাবদ্ধ। এছাড়া প্রাত্যহিক জোয়ার-ভাটা একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশীয় নিয়ামক। এগুলোর প্রত্যেকটি সাধারণত গাছপালার জন্য প্রতিকূল। প্রতিকূল পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্য এখানকার গাছগুলোর কিছু অভিযোজনিক বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন- শ্বাসমূল।

উদ্ভিদ: বিভিন্ন ধরনের উচ্চ বৃক্ষ প্রজাতির উদ্ভিদ এদেশের বনভূমিতে জন্মে এবং একক কোন প্রজাতি আধিপত্য বিস্তার করে না। বনে প্রজাতিবৈচিত্র্য বেশি। অধিকাংশই চিরসবুজ তবে বিচ্ছিন্ন কিছু পর্ণমোচী বৃক্ষ জন্মে। বৃক্ষগুলো ২-৩ স্তরে চাঁদোয়া (Canopy) গঠন করে। বৃক্ষের সাথে অনেক কাষ্ঠল লতা এবং পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ জন্মে। এছাড়া ফার্ণ, মস ও তাল জাতীয় গাছ জন্মে।

এছাড়া গ্রীষ্মমণ্ডলের অরণ্যের গাছগুলো লম্বা চওড়া পাতাবিশিষ্ট চিরসবুজ। বিভিন্ন উচ্চতার গাছ নিয়ে এটি কয়েক স্তরীয় বনভূমির সৃষ্টি করে। এসব বনে সব গাছ সমান উঁচু হয় না। সর্বোচ্চ গাছগুলো '৬০ মিটার (২০০ ফুট) পর্যন্ত লম্বা হয়। যেমন- গর্জন, চাপালিশ, সিভিট, তেলেগু। মাঝারি উচ্চতার গাছগুলো হলো চিকরাশি, গামার। সবচেয়ে ছোট আকারের গাছের মধ্যে জারুল ও উড়ি আম উল্লেখযোগ্য।

এছাড়াও পাহাড়ি অঞ্চলের বনভূমিতে চিরসবুজ, মিশ্র সবুজ, পাতা ঝরা, বেত ও বাঁশ বন দেখা যায়। এখানে সিভিট, গর্জন, চন্দুল, নাগেশ্বর, বাটনা, টালি, পিত্তরাজ, পুনাইল, কড়ুই, গামার, ভাদি, বান্দরহোলা, উদল, আমড়া, শিলভাদি ইত্যাদি বৃক্ষ দেখা যায়। এর মধ্যে গামার, কড়ুই, ভাদি, শিলভাদি, উদল, আমড়া পাতাঝরা বৃক্ষ। এ অঞ্চলে প্রচুর বাঁশ ও ছন বন দেখা যায়। শাল, পলাশ, কড়ুই, চাপালিশ প্রভৃতি এ বনের প্রধান গাছ।

ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের প্রধান উদ্ভিদ হলো বাইন, ওরা, কেওড়া, সইলাকাঁটা, গরান, কাঁকড়া, হিন্তাল, গোলপাতা, হারগোজা, খলশি, হোদা (টাইগার ফার্ন), নোনালতা, সুন্দ্রীলতা এবং অতি অল্প পরিমাণে সুন্দরী গাছ পাওয়া যায়।

নিম্নাঞ্চলের জলজ উদ্ভিদের মধ্যে শাপলা, পদ্ম, কলমি, হেলেঞ্চা, শোলা, পাতা শেওলা, ঝাঁঝি, শ্যামাকলা, ক্ষুদিপানা, কুচিপানা, কচুরিপানা, টোপাপানা, গুড়িপানা, পানিফল, পানি মরিচ ও বিভিন্ন জাতের ঘাস প্রধান।

অনাবাদি জমিতে জন্মানো উদ্ভিদ প্রজাতির মধ্যে কলকাসুন্দা, শ্বেতদ্রোন, রক্তদ্রোন, কাঁটানটে, নটেশাক, কাকমাছি, কান্তিকরি, ধুতুরা, হাতি শুড়, শিয়ালমতি, তারালতা, ভাট, মুক্তাঝুরি, কচু, খাগড়া ইত্যাদি প্রধান। আবার বাড়ির আশপাশে সুপারি, নারিকেল, আম, কাঁঠাল, কলা, লিচু, তেঁতুল, কুল, জাম, বাঁশ, বড়ই, পিপুল, আকন্দ ইত্যাদি বৃক্ষ প্রজাতির বিস্তার দেখা যায়।
প্রাণী: এ অঞ্চল প্রাণিবৈচিত্র্যেও সমৃদ্ধ। এখানে বহু প্রজাতির বিভিন্ন ধরনের ছোট বড় প্রাণী বাস করে। এর মধ্যে বানর, পাখি, সরীসৃপ, উভচর প্রাণী, শামুক, জোঁক, বিছা, মথ, পিঁপড়া, উইপোকা, কুনোব্যাঙ, সোনাব্যাঙ, টিকটিকি, গিরগিটি, কাছিম, গুঁইসাপ, তক্ষক, গোখরা সাপ, দাঁড়াশ সাপ, বেজি, চড়ুই, শালিক, টিয়া, কাক, চিল, শকুন, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া এ অঞ্চলের নদীতে শুশুক এবং অগভীর জলাভূমিতে টাকি, মেনি, বাইম বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ছাড়াও কাছিম, সারস, বক, কাঁদাখোচা পাখি, ঈগল, পানকৌড়ি, বক ইত্যাদি প্রাণী পাওয়া যায়। পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনে বিভিন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণী বাস করে। এখানে প্রচুর লাল কাঁকড়া, চিংড়ি মাছ পাওয়া যায়। সুন্দরবনের উল্লেখযোগ্য প্রাণী হচ্ছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার। সুন্দরবনের বনাঞ্চলে এখন মাত্র শ'দুয়েক বাঘ আছে। এছাড়া এ বনে ভোদর, বনবিড়াল, শূকর ও চিত্রা হরিণ আছে। এ বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীতে রয়েছে বিরাটাকায় কুমির।

এছাড়াও বিভিন্ন প্রাণিকূলের মধ্যে কাঠবিড়ালি, শিয়াল, খাটাশ, হনুমান, বাগডাস, কাঠ ঠোকরা, পেঁচা, চিল, নেউল, গুঁইসাপ, বৃহদাকার নির্বিষ অজগর, বিষাক্ত গোখরা সাপ, বড় ইঁদুর, উল্লুক, ভাল্লুক, হাতি, বনগরু ইত্যাদি প্রধান। এখানে এককালে প্রচুর চিতাবাঘ ও হরিণ ছিল, এখন নেই বললেই চলে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – জীবমন্ডল

টপিক – ০৯ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কার্বন চক্র

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কার্বন চক্র

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কার্বন চক্র

প্রকৃতির কার্বন যে প্রক্রিয়ায় CO_2 গ্যাসরূপে পরিবেশ থেকে জীবদেহে এবং জীবদেহ থেকে পরিবেশে আবর্তিত হয়ে প্রকৃতিতে কার্বনের সমতা বজায় রাখে তাকে কার্বন চক্র বলে।

কার্বন চক্র (Carbon Cycle)

প্রকৃতিতে কার্বনের মূল উৎস হলো বায়ুমণ্ডলের CO_2 গ্যাস। বায়ুতে এ গ্যাসের স্বাভাবিক পরিমাণ হলো ০.০৩%। জীবদেহে কোষ গঠন এবং সবুজ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কার্বনের প্রয়োজন। প্রকৃতিতে নিম্নলিখিত উপায়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড তথা কার্বনের ভারসাম্য বজায় থাকে।

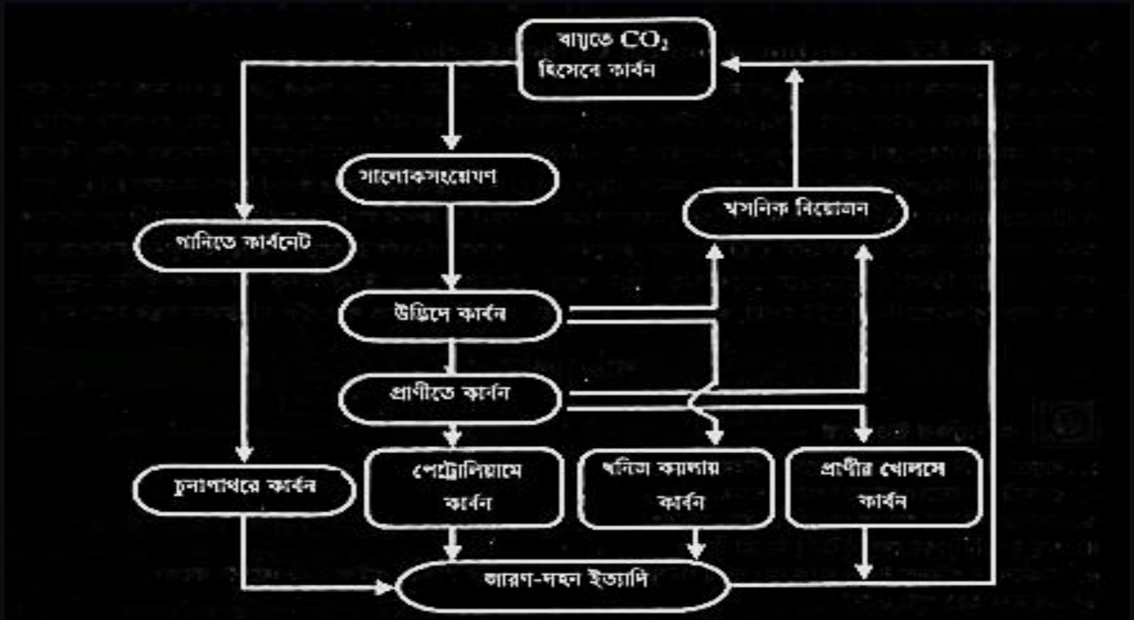

চিত্র-৯.৪: কার্বন চক্র

স্থলজ এবং জলজ সবুজ উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল এবং পানিতে মিশে থাকা CO_2 গ্যাস গ্রহণ করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় পাতার মধ্যে কার্বন সমন্বিত যৌগ তথা গ্লুকোজ (C6H12O6) উৎপন্ন করে। প্রাণীরা উদ্ভিদের তৈরি কার্বন যৌগকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে কার্বন সংগ্রহ করে। উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ের দেহেই কার্বন সমন্বিত যৌগ তথা গ্লুকোজ জারিত হলে CO_2 উৎপন্ন হয়, যা প্রকৃতিতে ফিরে যায়। উদ্ভিদজাত পদার্থ যেমন- কাঠ, কয়লা, কাগজ, পেট্রোল ইত্যাদি পদার্থের দহনক্রিয়ায় কার্বন যৌগ ভেঙে CO_2 গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং প্রকৃতিতে মুক্ত হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত্যুর পর পচনশীল জৈব বিয়োজক (জীবাণু) কর্তৃক বিয়োজিত হলে CO_2 গ্যাস নির্গত হয় ও প্রকৃতিতে ফিরে যায়। মাটিতে অবস্থিত বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ইত্যাদি শ্বসন প্রক্রিয়ায় CO_2 গ্যাস উৎপন্ন করে, যা বায়ুতে মিশে যায়। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় CO_2 গ্যাস বের হয়ে বায়ুতে মিশে যায়। জলজ প্রাণী যেমন- শামুক, ঝিনুক ইত্যাদির খোলক কার্বনেট দিয়ে গঠিত। এগুলো দহনের সময় অথবা উক্ত প্রাণীদের মৃত্যুর পর নানা প্রকার রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে CO_2 গ্যাস উৎপন্ন হয়ে পানিতে মিশে যায়। ফলে CO_2 গ্যাসের পরিমাণ প্রকৃতিতে স্বাভাবিক থাকে।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কার্বন চক্র

CO_2 এর ভারসাম্য বজায় রাখতে বারিমণ্ডল বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বাতাসে যে পরিমাণ কার্বন থাকে তার চেয়ে ৫০ গুণ বেশি কার্বন সমুদ্রের পানিতে বাইকার্বনেট রূপে মিশ্রিত থাকে এবং বায়ু ও সমুদ্রের পানির মধ্যে CO_2 এর আদান-প্রদান ঘটে।

সুতরাং, মূলত জীবের শ্বসন ও খনিজ বস্তুর দহন প্রক্রিয়ায় পরিবেশে CO_2 গ্যাসের ভাণ্ডার গড়ে উঠে এবং সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সবুজ উদ্ভিদে CO_2 গ্যাস গৃহীত হয়ে প্রকৃতিতে CO_2 গ্যাস তথা কার্বনের ভারসাম্য বজায় থাকে।

কার্বন চক্রের গুরুত্ব (Importance of Carbon Cycle)

কার্বন ছাড়া কোনো জীবদেহ তথা কোনো জৈব যৌগ গঠিত হতে পারে না। কার্বন সকল জৈব রাসায়নিক যৌগের মূল গাঠনিক উপাদান। এসব জৈব রাসায়নিক যৌগ দ্বারাই কোষপ্রাচীর, কোষঝিল্লি, প্রোটোপ্লাজম এবং এনজাইম গঠিত। কাজেই কার্বন জীবদেহের কাঠামো গঠনে সাহায্য করে। বিভিন্ন জৈব যৌগের উপাদান হিসেবে জীবদেহের বৃদ্ধি, বিপাক ও বংশবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সবুজ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার প্রধান উপাদান হলো CO_2। আর এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পৃথিবীতে জীবদেহে শক্তির (সূর্যালোকের সাহায্যে) সংবন্ধন ঘটে। সবুজ উদ্ভিদ বছরে বিপুল পরিমাণ কার্বন আত্তীকরণ করে। বায়ুমণ্ডলে CO_2 থাকার কারণে ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি মহাশূন্যে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং এ রশ্মির কিয়দংশ বায়ুমন্ডলে থেকে যায়। ফলে পৃথিবী সহনীয় মাত্রায় উত্তপ্ত থাকে, যা জীবন সৃষ্টির অনুকূল। কার্বন ছাড়া পৃথিবীতে জীবন সৃষ্টি হওয়া, জীবের বেঁচে থাকা এবং যাবতীয় জৈবিক কার্যাবলি পরিচালনা সম্ভব হতো না।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – জীবমন্ডল

টপিক – ১০ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় নাইট্রোজেন চক্র

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় নাইট্রোজেন চক্র

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় নাইট্রোজেন চক্র

যে চক্রাকার পদ্ধতি বায়ু থেকে নাইট্রোজেন প্রথমে মাটিতে এবং সেখান থেকে জীবদেহে, আবার জীবদেহ থেকে মাটিতে এবং মাটি থেকে বায়ুতে ফিরিয়ে দেয় তাকে নাইট্রোজেন চক্র বলে।

নাইট্রোজেন চক্র (Nitrogen Cycle)

নাইট্রোজেন চক্রে মোট পাঁচটি ধাপ রয়েছে।

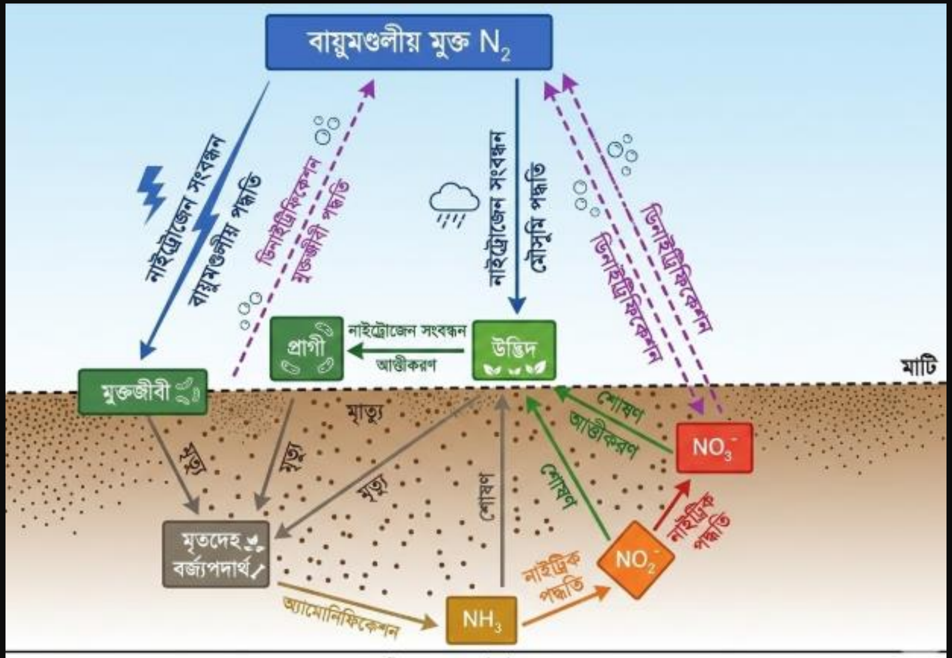

চিত্র-৯.৫: নাইট্রোজেন চক্র

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় নাইট্রোজেন চক্র

১. নাইট্রোজেন সংবন্ধন (Nitrogen fixation): বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেন গ্যাসকে ব্যবহার উপযোগী (উদ্ভিদ ও প্রাণী কর্তৃক) উপাদান বা যৌগে রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে নাইট্রোজেন সংবন্ধন বলে। এ ধাপটি আবার দুটি প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। যথা-

ক. ভৌত রাসায়নিক প্রক্রিয়া: ভৌত ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সংঘটিত নাইট্রোজেন স্থিতিকরণকে ভৌত রাসায়নিক নাইট্রোজেন সংবন্ধন বলে। N_2 এর ভৌত সংবন্ধন বজ্রপাত, বিদ্যুৎবীক্ষণ ও বৃষ্টিপাতের সময় ঘটে। বজ্রপাত, বিদ্যুৎবীক্ষণ ও বৃষ্টিপাতের সময় বায়ুমণ্ডলের N_2 অক্সিজেনের সাথে মিলিত হয়ে নাইট্রিক অক্সাইড (NO) সৃষ্টি করে। নাইট্রিক অক্সাইড পরবর্তী পর্যায়ে আবার অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়ে নাইট্রোজেন পারঅক্সাইড (NO_2) সৃষ্টি করে। নাইট্রোজেন পারঅক্সাইড। এরপর বৃষ্টির পানির সাথে নাইট্রিক (HNO3) ও নাইট্রাস (HNO_2) এসিডে পরিণত হয়ে মাটিতে পতিত হয়। মৃত্তিকার ক্ষারীয় মূলকের উপস্থিতিতে HNO, (নাইট্রিক এসিড) নাইট্রেট ও নাইট্রাইটে পরিণত হয় এবং উদ্ভিদ কর্তৃক শোষিত হয়। ফটোলাইসিস প্রক্রিয়ায় নাইট্রাস অক্সাইডগুলো নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন বা নাইট্রিক অক্সাইড ও নাইট্রোজেনে পরিবর্তিত হয়। ওজোনাইজেশন প্রক্রিয়ায় বায়ুস্থ নাইট্রোজেন জারিত হয়ে। নাইট্রাস অক্সাইড বা নাইট্রিক অক্সাইড জারিত হয়ে নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয়। হ্যাবার পদ্ধতিতে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন ৫০০° সে. তাপমাত্রায় এবং অধিক চাপে হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হয়ে অ্যামোনিয়াতে রূপান্তরিত হয়।

খ. জীবজ প্রক্রিয়া: কতকগুলো শৈবাল ও ব্যাকটেরিয়া এক বিশেষ পদ্ধতিতে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনকে নাইট্রেটে পরিণত করে মৃত্তিকায় আবদ্ধ করতে পারে। এই বিশেষ পদ্ধতিকে বায়োলজিক্যাল নাইট্রোজেন সংবন্ধন (Biological fixation of nitrogen) এবং ব্যাকটেরিয়া ও শৈবালগুলোকে যথাক্রমে নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী ব্যাকটেরিয়া এবং নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী শৈবাল বলে। নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী এরূপ ব্যাকটেরিয়ার উদাহরণ হলো Azotobacter, Clostridium ইত্যাদি। Nostoc, Anabaena প্রভৃতি নীলাভ সবুজ শৈবাল হলো নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী শৈবালের উদাহরণ। এসব ব্যাকটেরিয়া ও শৈবাল বায়ুর নাইট্রোজেনকে নাইট্রেটে রূপান্তরিত করে।

ছোলা, মটর, ধৈঞ্চা প্রভৃতি শিমগোত্রীয় উদ্ভিদের মূলে (Leguminosae গোত্র) এক প্রকার গুটি থাকে, এদের অর্বুদ (nodule) বলে। অর্বুদের মধ্যে রাইজোবিয়াম (rhizobium) নামক মিথোজীবী ব্যাকটেরিয়া বাস করে। এরাও মৃত্তিকাস্থিত বায়ুর নাইট্রোজেনকে নাইট্রেট লবণে পরিণত করে।

২. নাইট্রোজেন আত্তীকরণ (Nitrogen Assimilation): সবুজ উদ্ভিদ মাটি থেকে নাইট্রাইট, নাইট্রেট এবং কোনো ক্ষেত্রে অ্যামোনিয়াম আকারে অজৈব নাইট্রোজেন গ্রহণ করে। এই নাইট্রোজেন পরবর্তীতে নাইট্রোজেন জাতীয় জৈব যৌগে রূপান্তরিত হয়। এক্ষেত্রে নাইট্রেট প্রথমে অ্যামোনিয়াতে পরিণত হয় বা জৈব এসিডের সাথে মিলিত হয়ে অ্যামিনো এসিড গঠন করে। এই অ্যামিনো এসিড প্রোটিন, এনজাইম, নিউক্লিক এসিড ইত্যাদি সংশ্লেষণের কাজে ব্যবহৃত হয়। উদ্ভিদ থেকে গৃহীত খাদ্যের মাধ্যমে নাইট্রোজেন প্রাণিদেহে আসে।

৩. অ্যামোনিয়া তৈরি বা অ্যামোনিফিকেশন (Ammonification): উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত্যু হলে মৃতদেহের উপর কতকগুলো অণুজীব বিশেষ করে Bacillus জাতীয় ব্যাকটেরিয়া এবং একটিনোমাইসিটিস কাজ করে জৈব যৌগসমূহ বিপাকে ব্যবহার করে এবং অ্যামোনিয়া মুক্ত করে। ব্যাকটেরিয়াগুলোকে অ্যামোনিফাইং ব্যাকটেরিয়া এবং এ প্রক্রিয়াকে অ্যামোনিফিকেশন বলে। প্রাণীর নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থও অ্যামোনিফাইং ব্যাকটেরিয়া দিয়ে শোষিত হয়ে দেহজ উপাদানে পরিণত হয়। প্রাণিকুল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদ থেকে এ নাইট্রোজেন গ্রহণ করে।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় নাইট্রোজেন চক্র

৪. নাইট্রেট তৈরি বা নাইট্রিফিকেশন (Nitrification): বিমুক্ত অ্যামোনিয়া Nitrosomonas Nitrosococcus নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা প্রথমে নাইট্রাইটে পরিণত হয়। এসব ব্যাকটেরিয়াকে নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া বলে। Penicillium, Nitrobacter এবং Nitrocystis ইত্যাদির ন্যায় কিছু অণুজীবের কার্যকারিতায় নাইট্রাইট নাইট্রেটে পরিণত হয়। নাইট্রেট উৎপাদনের এই পদ্ধতিকে নাইট্রিফিকেশন বলে। নাইট্রিফিকেশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে কিছু শক্তি নির্গত হয়, যা ব্যাকটেরিয়ার কাজে লাগে।

$2NH2 + 3O2 \rightarrow 2HNO3 + 2H2O +$ শক্তি $2HNO2 + O2 \rightarrow 2HNO3 +$ শক্তি

৫. ডিনাইট্রিফিকেশন (Denitrification): অ্যামোনিয়া ও নাইট্রেট নির্দিষ্ট কিছু ব্যাকটেরিয়ার (যেমন- Thiobacillus denitrificans, Pseudomonus, Micrococcus denitrificans) কার্যকারিতায় মুক্ত নাইট্রোজেনে পরিণত হয়। এসব ব্যাকটেরিয়াকে ডিনাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া বলে। মাটি ও পানিতে অবস্থিত ডিনাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়ার কার্যকারিতার ফলে নাইট্রেট প্রথমে নাইট্রাইটে রূপান্তরিত হয় এবং তা থেকে শেষে নাইট্রোজেন মুক্ত হয়ে বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়। এ প্রক্রিয়াকে ডিনাইট্রিফিকেশন বলে। এতে মাটি ও পানির নাইট্রেট থেকে নাইট্রোজেন মুক্ত হয়ে পরিবেশে নাইট্রোজেনের ভারসাম্য রক্ষা করে।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় নাইট্রোজেন চক্র

নাইট্রোজেন চক্রের গুরুত্ব (Importance of Nitrogen cycle)

প্রাকৃতিক নাইট্রোজেন চক্রে নাইট্রোজেন মৌল বিভিন্ন আকারে বায়ু থেকে মাটি, মাটি থেকে উদ্ভিদ ও উদ্ভিদ থেকে প্রাণীতে সঞ্চারিত হয়। অবশেষে জীবজগৎ থেকে মাটি এবং বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসে। এভাবে প্রকৃতিতে নাইট্রোজেন চক্র অবিরাম চলতে থাকে, কখনও থেমে যায় না। বর্তমানে যান্ত্রিক কৃষিপদ্ধতির ফলে প্রাকৃতিক নাইট্রোজেন চক্র ভীষণভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। যেমন কতিপয় দানাশস্য যথা ভুট্টা মাটি থেকে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন শোষণ করে। প্রতি বছর যদি মাটির নাইট্রোজেনের ভারসাম্য অবস্থা ফিরিয়ে আনা না যায়, তাহলে মাটি অনুৎপাদী হয়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে নাইট্রোজেন স্থায়ীকরণকারী উদ্ভিদের (Leguminosae) চাষাবাদের মাধ্যমে বা জৈব নাইট্রোজেনঘটিত সারের মাধ্যমে মাটির নাইট্রোজেনের অভাব পূরণ করা সম্ভব। কিন্তু ফলশ্রুতিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগের ফল হিসেবে বেশি নাইট্রেট মাটি থেকে নদী, খাল ও পুকুরের পানিতে মিশে পানিকে দূষিত করছে। সুতরাং নাইট্রোজেন চক্রের স্বাভাবিকতা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – জীবমন্ডল

টপিক – ১১ প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষণ: মাটি দূষণ, বায়ু দূষণ,পানি দূষণ, শব্দ দূষণ

প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষণ: মাটি দূষণ, বায়ু দূষণ,পানি দূষণ, শব্দ দূষণ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

কোনো কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানগুলোতে বিষাক্ত পদার্থের সংযোজন ঘটলে তাকে দূষণ (Pollution) বলে। আর উপাদানসমূহের স্বাভাবিক গুণাগুণ হ্রাস পেলে তাকে অবক্ষয় (degradation) বলে। তবে দূষণ ও অবক্ষয় শব্দ দুটি প্রায়ক্ষেত্রেই একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। নিচে পরিবেশের প্রধান প্রধান উপাদানের দূষণ, তার কারণ ও প্রতিরোধের উপায় আলোচনা করা হলো:

মাটি দূষণ (Soil Pollution)

মাটি বলতে আমরা বুঝি পৃথিবীর উপরিভাগের স্তর যা নরম এবং নানা ধরনের জৈব ও অজৈব পদার্থের মিশ্রণে গঠিত। মাটির উপরে আমরা বসবাস করি। মাটি থেকে আমাদের জীবন ধারণের নানারকম প্রয়োজনীয় উপাদান গ্রহণ করি। উদ্ভিদ ও প্রাণী মরে গেলে এগুলো আবার মাটিতে ফিরে (পচনের মাধ্যমে অজৈব উপাদান বিশ্লিষ্ট হয়ে) যায়। ফলে মাটির বিভিন্ন উপাদান আমরা ঘুরে ঘুরে বার বার ব্যবহার করতে পারি। তাই বলা যায়, মাটির সাথে আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। মাটি দূষিত হলে আমাদের জীবনযাত্রায় মারাত্মক প্রভাব পড়ে। মাটিতে বিষাক্ত বর্জ্য, রাসায়নিক পদার্থের সংযোগ ও কীটনাশক প্রয়োগ প্রতিনিয়ত মাটি দূষণ করছে ।

মাটি দূষণের কারণ (Causes of Soil Pollution)

মাটি নানাভাবে দূষিত হয়। বন্যা, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদি প্রাকৃতিক কারণে মাটি ক্ষয় হয়। বন্যার ফলে মাটি ক্ষয়ে গিয়ে অনুর্বর হয়ে পড়ে। মাটিতে তখন গাছপালা জন্মাতে পারে না। বৃষ্টিপাত ও বায়ুপ্রবাহ একইভাবে মাটির উপরের উর্বর স্তর সরিয়ে নিয়ে মাটি অনুর্বর করে ফেলে।

মানুষের নানা কাজ মাটিকে দূষিত করে। বন ও গাছপালার ধ্বংস সাধন, অতিমাত্রায় কৃষিকাজ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার, অতিরিক্ত পানি সেচ ইত্যাদির কারণে মাটি দূষিত হয়। গাছপালা না থাকলে এবং অতিমাত্রায় কৃষিকাজ করলে মাটির উর্বর স্তর ক্ষয় হয়ে মাটি অনুর্বর হয়ে পড়ে। অতিরিক্ত পানি সেচের ফলে মাটিতে জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততার সৃষ্টি হয়। মাটির নিচের লবণ পানিতে দ্রবীভূত হয়ে উপরে উঠে এসে মাটিকে অনুর্বর করে তোলে। এছাড়া নানা ধরনের বর্জ্য পদার্থ মাটি দূষণের অন্যতম কারণ। ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ এবং প্রকৃতিতে ধীরে ধীরে মিশে যায় না এমন পদার্থ (পলিথিন, প্লাস্টিক) মাটিকে দূষিত করে।

মাটি দূষণের প্রভাব: (Effects of Soil Pollution)

১. উৎপাদনশীলতা হ্রাস: রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের অতিরিক্ত ব্যবহার মাটির উর্বরতা কমিয়ে দেয়।

২. জলাধার দূষণ: দূষিত মাটি থেকে ভারী ধাতু ও বিষাক্ত পদার্থ পানিতে চলে যায়, ফলে জলাশয়ও দূষিত হয়।

৩. উদ্ভিদের ক্ষতি: দূষিত মাটিতে গাছপালা সঠিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে না, ফলে ফসলের পরিমাণ ও গুণমান কমে যায়।

৪. স্বাস্থ্যঝুঁকি: দূষিত মাটিতে উৎপন্ন খাবার খেলে মানুষের শরীরে বিষাক্ত পদার্থ প্রবেশ করে।

মাটি দূষণ প্রতিরোধে করণীয় (Measures to Prevent Soil Pollution)

মাটি দূষিত হলে তাতে গাছপালা, পোকামাকড়, অণুজীব জন্মাতে পারে না। এর ফলে মাটি অনুর্বর হয়ে ধীরে ধীরে মানুষের ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য উর্বর (উৎপাদনশীল) মাটি প্রয়োজন। এ কারণে মাটি যাতে অনুর্বর ও দূষিত না হয় আমাদের সবারই সেদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। বেশি করে গাছপালা লাগানো মাটি দূষণ রোধের একটি উপায়। কলকারখানাগুলো যেন শিল্প বর্জ্য যেখানে সেখানে না ফেলে সে বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের পরিবর্তে অধিক জৈব সার ও প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে কীট পতঙ্গ প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

বায়ু দূষণ (Air Pollution)

বায়ু দূষণের কারণ (Causes of Air Pollution)

কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2): শিল্প-কারখানা, বিভিন্ন ধরনের চুল্লি (যেমন- ইটভাটা) ও মোটরযান হতে কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গত হয়। জীবাশ্ম জ্বালানি (কয়লা, লিগনাইট, প্রাকৃতিক গ্যাস) দহনের জন্য সারা বছর পৃথিবীতে ১৮ × ১০১২ টনের অধিক কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়। অন্যদিকে গাছপালা হ্রাস পাওয়ায় বাতাসে কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে।

নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ: মোটরযান, শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র, প্লাস্টিক, এসিড ও বিস্ফোরক নির্মাণকারী কারখানাসহ বিভিন্ন কারখানায় নাইট্রোজেন জারিত হয়ে (শিল্পের উপজাত হিসেবে) বিভিন্ন প্রকার অক্সাইড তৈরি করে। বর্তমানে পরিবেশে NO, এর উপস্থিতি ব্যাপক ও এর ক্ষতির মাত্রাও বেশি।

সালফার ডাইঅক্সাইড (SO_2): শিল্প-কারখানা ও শক্তি উৎপাদক কেন্দ্র থেকে এ গ্যাস বের হয় ও বাতাসে মিশে যায়। এ গ্যাসের সাথে আরও অনেক কিছু মিশে থাকে। যেমন- সীসা, তামা, জিংক, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি ভারি ধাতু, হাইড্রোজেন সালফাইড, হাইড্রোক্লোরিক এসিড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, হাইড্রোকার্বন ও ৩, ৪ বেনজোপাইরিন। এগুলো মিলে ধোঁয়া সৃষ্টি হয়।

ক্লোরো-ফ্লুরোকার্বন (CFC): CFC হলো কার্বন, ফ্লোরিন ও ক্লোরিনের একটি উদ্বায়ী (Volatile) যৌগ। এটি রেফ্রিজারেটর, এয়ারকন্ডিশনার, প্লাস্টিক ও রং তৈরির কারখানা হতে নির্গত হয়। CFC ওজোন স্তরকে ধ্বংস করছে। ১ অণু CFC গ্যাস ২০০০ ওজোন অণুকে (তাপমাত্রা ভেদে) ধ্বংস করতে পারে।

ভারি ধাতু: পারদ, সীসা, ক্যাডমিয়াম, দস্তা, ক্রোমিয়াম, নিকেল প্রভৃতি ভারি ধাতু। এই ভারি ধাতুগুলো শিল্প-কারখানা, মোটরযান ও মানুষের বিভিন্ন কর্মকান্ডে (যেমন- যত্রতত্র আবর্জনা নিক্ষেপ) প্রকৃতিতে অধিক ছড়ায়।

ধূলিকণা: অনেক সময় কল-কারখানা থেকে ধূলিকণা নির্গত হয়ে বাতাসের সাহায্যে ছড়িয়ে পড়ে। পাটকল, বস্ত্রকল ইত্যাদি থেকে প্রচুর ধূলিকণা নির্গত হয়। এসব ধূলিকণা অনেকক্ষেত্রে ধোঁয়ার সাথে মিশে পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি করে।

তেজস্ক্রিয় পদার্থ: তেজস্ক্রিয় পদার্থ পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র অথবা পারমাণবিক বিস্ফোরণ, পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা ইত্যাদি থেকে উপজাত হিসেবে নির্গত হয় এবং বায়ুদূষণ ঘটায়।

কীটনাশক, আগাছা ও ছত্রাক নাশক ওষুধ প্রয়োগ: কৃষিক্ষেত্রে অতিরিক্ত কীটনাশক, আগাছা নাশক ও ছত্রাক নাশক ব্যবহার করে মানুষ পরিবেশ দূষণ করছে। ডিডিটি, এলড্রিন, ক্লোরডেন, হেপ্টাক্লোর, আনসার ইত্যাদি ওষুধ পৃথিবীর সব দেশেই কম-বেশি ব্যবহার হচ্ছে, যা আজ পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ।

বায়ু দূষণের প্রভাব (Effects of Air Pollution)

১. শ্বাসযন্ত্রের রোগ: ধোঁয়া ও ধূলিকণার কারণে হাঁপানি, ব্রংকাইটিস, ক্যান্সারসহ নানা শ্বাসকষ্টজনিত রোগ দেখা দেয়।

২. জলবায়ু পরিবর্তন: গ্রিনহাউস গ্যাস বায়ুমণ্ডলে বৃদ্ধি পেয়ে বৈশ্বিক উষ্ণতা বাড়ায়।

৩. অম্লবৃষ্টি (Acid Rain): সালফার ও নাইট্রোজেন অক্সাইড বায়ুতে মিশে অম্লবৃষ্টি সৃষ্টি করে; যা ফসল, মাটি ও স্থাপনার ক্ষতি করে।

৪.চোখে সমস্যা: বায়ু দূষণের ফলে দৃষ্টিশক্তির সমস্যা ও চোখে জ্বালাপোড়া হয়।

বায়ু দূষণ রোধের উপায় (Measures to Prevent Air Pollution)

১. চার স্ট্রোক ইঞ্জিন ব্যবহার: দুই স্ট্রোক ইঞ্জিনের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং চার স্ট্রোক ইঞ্জিনের ধোঁয়া পরিশোধনের ব্যবস্থা করা।

১. প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার: খনিজ তেলের পরিবর্তে মোটরযানে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা।

২. শিল্প কারখানা দূরে স্থাপন: শিল্প-কারখানা, ইটের ভাটা লোকালয় থেকে দূরে স্থাপন করা।

৩. সিএফসির ব্যবহার কমানো: ওজোন স্তর ক্ষয়কারী সিএফসি গ্যাস ব্যবহার না করে বিভিন্ন যন্ত্রাংশে বিকল্প হিসেবে তরল পেট্রোলিয়াম ব্যবহার করা।

৪. গণসচেতনতা সৃষ্টি: ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিয়মিত প্রচার করা যাতে বায়ুদূষণ বিষয়ে প্রত্যেকে সচেতন থাকে এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে। পাঠ্যবইয়ে এটা গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করা।

৫. গাছ লাগানো: পর্যাপ্ত পরিমাণে গাছ লাগানো ও বৃক্ষরোপণ অভিযান পরিচালনা করা

পানি দূষণ (Water Pollution)

পানি দূষণের উৎস ও কারণ (Sources & Causes of Water Pollution)

১. নর্দমার ময়লা (Sewage): নদী বা কূপ যা হতে আমরা খাওয়ার পানি পেয়ে থাকি এগুলো সাধারণত নর্দমার ময়লা (Domestic Sewage) দ্বারা কলুষিত হয়। শহরাঞ্চলের নর্দমাগুলো সাধারণত নদীতে গিয়ে শেষ হয় এবং এগুলো দ্বারা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের মলমূত্র ও অন্যান্য ময়লা আবর্জনা নদীতে পতিত হয়। এছাড়া মানুষ বা অন্যান্য পশুর মল, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদির অপ্রয়োজনীয় অংশ নদীতে পতিত হলে এগুলো ব্যাকটেরিয়ার প্রভাবে অজৈব পদার্থে রূপান্তরিত হয়। ব্যাকটেরিয়াসমূহের এ ধরনের কার্যাবলির জন্য প্রচুর অক্সিজেন খরচ হয়।

২. শিল্পের আবর্জনা (Industrial wastage): শিল্পবিপ্লবের শুরু হতেই শিল্পসমূহ হতে নির্গত ময়লা ও আবর্জনা নদী ও সমুদ্রের পানি কলুষিত হওয়ার প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। কাগজ ও কাগজমণ্ড, বস্ত্র, চিনি, সার, লৌহ জাতীয় ধাতু, চামড়া ও রাবার, ওষুধ ও রাসায়নিক শিল্প-কারখানা হতে নির্গত আবর্জনাসমূহ বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদানে গঠিত। এসব শিল্পের বর্জ্য অহরহ পানিকে দূষিত করছে।

৩. তাপমাত্রার বৃদ্ধি (Increased temperature): তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে পানিতে অক্সিজেনের ভাগ কমে যায়। শিল্প ও পারমাণবিক চুল্লিসমূহকে ঠান্ডা রাখার জন্য প্রতিনিয়ত পানি সরবরাহ করা হয় এবং এসব পানি আবার নদীতে উত্তপ্ত অবস্থায় ফিরে আসে। এভাবে এসব স্থানের পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে এবং তা দূষিত হয়।

৪. তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থ (Radioactive wastage): বর্তমান আণবিক যুগে মানুষ তাদের ঘর উষ্ণ রাখার জন্য, খাদ্য সংরক্ষণের জন্য, শিল্পের শক্তি সরবরাহের জন্য ও গাড়ির জ্বালানি সরবরাহের জন্যে বিভিন্ন ধরনের পরমাণু ও তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে। পারমাণবিক চুল্লি ও অন্যান্য পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে উদ্ভূত তেজস্ক্রিয় আইসোটোপগুলো পানিতে মিশে গিয়ে উদ্ভিদ ও প্রাণীদের ক্ষতিসাধন করতে পারে।

৫. কীটপতঙ্গ ও আগাছানাশক ওষুধ (Pesticides and Herbicides): মানুষ উন্নতমানের বীজ, সার, উন্নত ধরনের সেচ ব্যবস্থা ও বিভিন্ন ধরনের মড়ক, আগাছা ও পোকা দমনকারী ওষুধ ইত্যাদি ব্যবহার করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করছে। এ ধরনের যৌগিক ওষুধসমূহ যখন উদ্ভিদের ওপর ছড়ানো হয় তখন এরা মাটিস্থ পানির সাথে মিশে পানিকে দূষিত করে। এছাড়া ওষুধগুলো বৃষ্টির পানির সাথে নদী ও সাগরে গিয়ে পড়ে এবং জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহে জমা হয়। এতে জলজ জীবের প্রভূত ক্ষতিসাধন হয়।

৬. এসিডসমূহ (Acids): খনিসমূহ হতে নির্গত এসিডসমূহ পানিতে এসিডের হার বৃদ্ধি করে থাকে। পানিতে এসিডের পরিমাণ অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পেলে বহু জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রতি এটি হুমকি হয়ে দাঁড়ায়।

৭. পলি ও তলানি (Silt and Sediments): ভূমিক্ষয় ও পাহাড় ধসের ফলে পানিবাহিত মাটি, বালুকণা ইত্যাদি পানিকে দূষিত করে। পানি ঘোলাটে হলে জলজ প্রাণীর ডিম ও লার্ভার স্বাভাবিক বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। চলাফেরায় বিঘ্ন ঘটে এবং খাদ্যের অভাব ঘটে।

৮. তেল (Oils): পানিতে তেলের সংমিশ্রণ অথবা পানির উপর তেলের বিস্তার জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। বিশেষ করে সমুদ্রে তেলবহনকারী ট্যাংকার থেকে দুর্ঘটনার ফলে অপরিশোধিত তেল নির্গত হলে তা পানিতে মিশে যায় এবং বহু এলাকা জুড়ে জীবকুলের ক্ষতি করে থাকে।

৯. ভারি ধাতু (Heavy metals): ধাতুর আণবিক সংখ্যা ২৩ এর বেশি হলে তাকে ভারি ধাতু বলে। ভারি ধাতুর মধ্যে রয়েছে ম্যাঙ্গানিজ, আয়রন, কপার, জিংক, লেড ইত্যাদি। এছাড়াও রয়েছে রেডিয়াম, প্লুটোনিয়াম, কোবাল্ট যা তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে নির্গত হয়ে পানি দূষণ ঘটায়। পানির সাথে এসব ধাতু মানুষের দেহে প্রবেশ করে। দেহে ভারি ধাতুর আধিক্য ঘটলে বিপাক ক্রিয়ার সমস্যা দেখা দেয় ও দৈহিক বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়, এমনকি কখনও জীবের মৃত্যুও ঘটে থাকে।

পানি দূষণ রোধের উপায় (Measures to Prevent Water Pollution)

১. বিষাক্ত বর্জ্য নিয়ন্ত্রণ; শিল্প-কারখানার বিষাক্ত বর্জ্য নদী-নালা ও অন্যান্য জলাশয়ে না ফেলা।

২. বর্জ্য ও আবর্জনা শোধন: শিল্প-কারখানার ল্প-কারখানার দূষিত তরল বর্জ্য যথাযথভাবে শোধনপূর্বক নদী-নালাতে নিক্ষেপ করা। পয়ঃপ্রণালি ও গৃহস্থালির আবর্জনা ও ময়লা জলাশয়ে নিষ্কাশনের পূর্বে যথাযথভাবে শোধন করা। পয়ঃপ্রণালি বাহিত আবর্জনাগুলোকে নদীতে নিক্ষেপ করার পূর্বে ফিল্টার ট্যাংক বা জারন ট্যাংক এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করতে হবে। ফিল্টার ও জারন ট্যাংকগুলোতে বিয়োজক অণুজীব রেখে পয়ঃপ্রণালি বাহিত জৈব আবর্জনাগুলোকে এমনভাবে পরিবর্তিত করতে হবে, যাতে তারা ক্ষতিকর অবস্থায় না থাকে।

৩. কীটনাশক ও সারের নিয়ন্ত্রণ; কীটনাশক, ছত্রাকনাশক, আগাছানাশক ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার সীমিত রাখা এবং এদের ব্যবহারে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করা। সাথে সাথে জৈব সারের ও প্রাকৃতিক কীটনাশকের ব্যবহার বাড়াতে এবং সমন্বিত কীট ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করতে হবে

৪. তেল নিষ্কাশন নিয়ন্ত্রণ: পানিতে তেল নিষ্কাশন বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া।

৫. জলাশয়ে গোসল ও কাপড় কাচা বন্ধ রাখা: পুকুরসহ অন্যান্য আবদ্ধ জলাশয়ে গোসল ও কাপড় কাচা বন্ধ রাখা।

৬. কচুরিপানা ও শৈবাল নিয়ন্ত্রণ; জলাশয়, খাল-বিল যাতে কচুরিপানা ও ভাসমান শৈবালে ভরে না যায়, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

৭. খনিজ পদার্থের নিয়ন্ত্রণ: খনিজ বর্জ্য যাতে নদী ও সমুদ্রের পানিতে শোধনপূর্বক নির্গত হয়, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

৮. আইন প্রয়োগ: পরিবেশ বিষয়ক কঠোর আইন প্রণয়ন করা ও তার প্রয়োগ নিশ্চিত করা। ইউরোপীয় দেশগুলোতে পানিদূষণের বিরুদ্ধে ভীষণ কঠোর আইন রয়েছে। জলজ যানবাহনের তেল, ময়লা আবর্জনা থেকে যেন পানি দূষিত না হয়, তার ব্যবস্থা সব জলযানকে নিতে হয়। না নিলে কঠোর শাস্তি বা জরিমানার সম্মুখীন হতে হয়।

শব্দ দূষণ (Noise Pollution)

শব্দ দূষণের কারণ (Causes of Noise Pollution)

মানুষের ক্রিয়াকলাপই শব্দ দূষণের প্রধান কারণ। নগরায়ণ ও শিল্পের প্রসার, প্রযুক্তির অগ্রগতি, পরিবহনের উন্নতি এবং মানুষের জীবনপ্রণালিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনই শব্দ দূষণের কারণ। বর্তমানে শব্দদূষণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন কর্মব্যস্ত নগর ও শহরে নির্মাণ স্থলে, হাসপাতালে, অফিস ও আদালতে এবং শিক্ষায়তনে শব্দ দূষণ বেড়ে চলেছে। শব্দ দূষণের বিভিন্ন কারণ অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

১. সামাজিক কারণ:

ক. মিটিং মিছিল প্রভৃতিতে, বিবাহশাদিতে এবং অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত মাইকের উচ্চ-তীব্র শব্দে মানুষের ক্ষতি হয়।

খ. বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আতশবাজি পোড়ানোর রীতি আমাদের সমাজে প্রচলিত। কিন্তু আতশবাজি পোড়ানোর ফলে এর অনিয়মিত এবং তীব্র শব্দে অবর্ণনীয় শব্দ দূষণ ঘটে। এটি মানুষের অপূরণীয় ক্ষতি করে থাকে।

গ. নগরীয় জীবনে জঞ্জাল অপসারণ এবং অবকাঠামো নির্মাণ প্রভৃতি কর্মকাণ্ডও শব্দ দূষণের সৃষ্টি করে।

২. পরিবহন: শব্দ দূষণের প্রধান উৎস পরিবহন। ডিজেল ইঞ্জিনযুক্ত যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি পরিবহনজনিত শব্দদূষণের কারণ। বাস, ট্রাক, লরি, কার, মোটরসাইকেল প্রভৃতি চলাচলের শব্দ এবং অনিয়ন্ত্রিতভাবে উচ্চ-তীব্রতাযুক্ত বৈদ্যুতিক হর্নের ব্যবহারের ফলে শহরের ট্রাফিক অঞ্চলে, হাসপাতাল সংলগ্ন রাস্তায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য কর্মব্যস্ত স্থানে শব্দ দূষণ সৃষ্টি হয়।

৩. শিল্প প্রক্রিয়া: বিভিন্ন শিল্প সংস্থায় প্রক্রিয়াকরণের সময় যান্ত্রিক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন শব্দ কর্মরত শ্রমিক ও অন্যান্য কর্মী এবং পার্শ্বস্থ অঞ্চলের জনবসতির উপর দূষণজনিত প্রভাব সৃষ্টি করে। যেমন- নিউজপেপার প্রেস (100 dB), টেক্সটাইল লুম এবং চাবি পাঞ্চিং মেশিন (180 dB) এর প্রক্রিয়াকরণ কাজের ফলে শব্দ দূষণ সৃষ্টি হয়।

৪. যান্ত্রিক ক্রিয়া: অফিস, দোকান, স্কুল, কলেজ এবং অন্যান্য সামাজিক কাজে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যে ডিজেল চালিত জেনারেটর ব্যবহৃত হয়, এর ফলে শব্দ দূষণ সৃষ্টি হয়। এরকম আরও উদাহরণ- মোটর বাইক, শ্যালো মেশিনের ইঞ্জিন চালনা ইত্যাদি।

৫. আকাশ পরিবহন: আকাশ পরিবহনজনিত কারণেও শব্দ দূষণ ঘটে। বিমানবন্দরের রানওয়েতে বিমান চালু করার সময় এবং আকাশপথে উড়ার সময় ভয়ানক শব্দ দূষণ সৃষ্টি হয় (110 dB)। অপেক্ষাকৃত বড় এবং গতিশীল জেট বিমান কর্তৃক সৃষ্ট শব্দদূষণের মাত্রা অনেক বেশি। পাশ্চাত্যের আধুনিক সুপারসনিক এয়্যারক্র্যাফট (যথা- অতিশয় দ্রুতগতিসম্পন্ন কনকর্ড) যন্ত্রণাদায়ক শব্দ দূষণের সৃষ্টি করে।

৬. কথোপকথন: মানুষের উচ্চস্বরে কথা বলার সময়ও শব্দ দূষণ সৃষ্টি হয়। স্বাভাবিক স্বরে মানুষের কথোপকথনের সময় শব্দ দূষণ উৎপন্ন হয় না (60 dB)। কিন্তু কোনো জমায়েত স্থলে, অফিসে, রেস্টুরেন্টে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চস্বরে কথা বলার ফলে যন্ত্রণাদায়ক শব্দ দূষণের (85dB) সৃষ্টি হতে পারে।

শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধ (Control and Prevention of Noise Pollution)

শব্দ দূষণ প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ করার তিনটি উপায়ে আলোচনা করা যেতে পারে। যথা- ১. আইনসম্মত, ২. প্রযুক্তিগত এবং ৩. ব্যক্তিগত উপায়।

১. আইনসম্মত উপায়ে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ: শব্দ দূষণ প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণমূলক আইন তৈরি এবং প্রয়োগের মাধ্যমে শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। যেমন-

i. উৎস থেকে নির্গত শব্দের সুনির্দিষ্ট তীব্রতা সম্পর্কীয় আইন প্রণয়ন করা উচিত। বাস, ট্রেন, এরোপ্লেন, শিল্প কারখানা এবং ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে লাউড স্পিকার নিঃসৃত শব্দের তীব্রতা নির্দেশিত মাত্রায় বা তার নিচে বজায় রাখা জরুরি। এক্ষেত্রে অবশ্যই আইনভঙ্গকারীর কঠোর শাস্তির বিধান থাকা উচিত।

ii. যানবাহন নিঃসৃত শব্দের ব্যাপকতা এবং তীব্রতা হ্রাসের জন্য আইন করে উন্নত প্রযুক্তির ডিজেল ইঞ্জিন এবং এগজস্ট গ্যাস (যেমন- কার্বন মনোঅক্সাইড, কার্বন ডাইঅক্সাইড) পাইপে সাইলেন্সারের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা উচিত। যানবাহনের গতি হ্রাস করে এবং 'নন-স্টপ' রীতি চালু করে শব্দ দূষণ হ্রাস করা যায়।

iii. জনবহুল অঞ্চল থেকে দূরবর্তী স্থানে হাইওয়েগুলোর রুট চালু করা উচিত।

iv. ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকায় শব্দ উৎপাদনকারী শিল্প বা কারখানার স্থাপন নিষিদ্ধ করা দরকার।

V. হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, আদালত এবং অফিস সংলগ্ন অঞ্চলে শব্দ উৎপাদন নিষিদ্ধ হওয়া উচিত।

viii. ধর্মীয় এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে আতশবাজির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা উচিত এবং লাউড স্পিকার ব্যবহারের জন্য সময় এবং তীব্রতার মাত্রা নির্দিষ্ট করা উচিত।

২. প্রযুক্তিগত উপায়ে শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ: প্রযুক্তির প্রয়োগের দ্বারা শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। এর মাধ্যমে যানবাহন, মেশিন বা অন্যান্য শব্দ উৎপন্নকারী যন্ত্রপাতি থেকে উৎপন্ন শব্দের তীব্রতা হ্রাস করা যায়। যথা-

i. উৎসস্থলে শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ: শিল্প কারখানায় উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন কম শব্দ উৎপন্নকারী মেশিন স্থাপন করে উৎসস্থলে শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

ii. শব্দ প্রতিরোধক আচ্ছাদন ব্যবহার: কারখানা বা শিল্প সংস্থায় শব্দ উৎপন্নকারী মেশিন বা যন্ত্রপাতি শব্দ অপরিবাহী বা অভেদ্য বস্তুর দ্বারা আচ্ছাদিত করে শব্দদূষণ হ্রাস করা যায়।

iii. শব্দ প্রতিরোধক ডিভাইস ব্যবহার: দূষণস্থলে শব্দ প্রতিরোধক ডিভাইস (device) ব্যবহারে অনুপ্রাণিত করে শব্দদূষণের প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করা যায়। শব্দ প্রতিরোধক ডিভাইস শ্রবণ প্রতিরক্ষা কৌশল (Hearing Protection Device) বা HPD নামেও পরিচিত।

iv. অ্যাকুয়াসটিক জোনিং: শিল্প-কারখানায় বায়ু বা কঠিন মাধ্যমে শব্দের সঞ্চারণ প্রতিরোধক 'অ্যাকুয়াসটিক জোনিং' (Acoustic zoning) ব্যবহার করে শব্দদূষণ প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

৩. ব্যক্তিগত উপায়ে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ: ব্যক্তিগত উপায়ে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। যেমন-

i. পেশাগত কাজে শব্দ প্রতিরোধক ডিভাইস ব্যবহারের মাধ্যমে দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যেমন- মোবাইলের রিংটোন কমিয়ে রাখা, ইয়ারফোন ব্যবহার করা।

ii. ব্যক্তিগত কাজ যথা- ক্লিনিং, ওয়াশিং, টয়লেট ফ্লাশিং, গার্বেজ ডিসপোজাল, বিনোদনে ব্যবহৃত রেডিও, টিভি এবং সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবে ব্যবহৃত লাউড স্পিকার থেকে সৃষ্ট শব্দদূষণ নিজ উদ্যোগে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। উপরিউক্ত ক্রিয়াকলাপে শব্দের তীব্রতার মাত্রা 75 থেকে 120 dB হলে তা যথেষ্ট ক্ষতিকারক।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – জীবমন্ডল

টপিক – ১২ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সাকিব বিগত শীতে বাংলাদেশের দুটি বনে বেড়াতে গিয়েছিল। একটি বনে জোয়ার-ভাটার পানি প্রভাবিত অরণ্য এবং অন্যটি বাংলাদেশের প্রায় মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত বনভূমিতে পত্রশূন্য অবস্থা দেখতে পায়।

(কু. বো., সি. বো,, ব. বো ২০১৯)

ক. বায়োম কী?

খ. ইকোসিস্টেম ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের প্রথমোক্ত বনভূমির ধরন ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বনভূমিদ্বয়ের বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য বিশ্লেষণ করো।

রোহানের বাবা মধুপুরের বন অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা। সে তার বাবার কর্মস্থলে হাতি দেখতে যায়। তার বাবা তাকে বলে আগে এখানে অনেক হাতি ছিল কিন্তু বর্তমানে এগুলো অন্যত্র সরে গেছে। হাতি ছাড়াও অন্যান্য জীববৈচিত্র্যও সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। এ জন্য জীববৈচিত্র্য রক্ষায় বন অধিদপ্তরসহ সকলের এগিয়ে আসা উচিত।

ক. তুন্দ্রা বায়োম কী?

খ. কার্বন চক্র গুরুত্বপূর্ণ কেন?

গ. রোহান মধুপুরে হাতি দেখতে পেল না কেন? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত সংকুচিত হয়ে আসা বিষয়টির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো।

শাহীন তার পুকুরে মাছ ধরতে গিয়ে দেখলো পুকুরে কোনো মাছ নেই। সে দেখলো পুকুরের পাশের কারখানা থেকে বর্জ্য এসে পুকুরে পড়ছে।

ক. ভারসাম্য অবস্থা কাকে বলে?

খ. কেন আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রয়োজন?

গ. শাহীনদের পুকুরে মাছ না থাকার কারণ কী ছিল? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কারখানাটি না থাকলে শাহীন পুকুরের কীরূপ অবস্থা দেখতে পেত? বিশ্লেষণ করো।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – জীবমন্ডল

টপিক – ১৩ বহুনির্বাচণী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচণী প্রশ্ন সমাধান

জীবমণ্ডলের বৃহৎ ভৌগোলিক একক হচ্ছে- (সকল বোর্ড ২০১৯)

ক. ইকোসিস্টেম খ. ইকোলজি গ. বায়োমাস ঘ. বায়োম

গ্রীনল্যান্ড অঞ্চলে কোন বায়োম দেখা যায়? সকল বোর্ড ২০১৯/

ক. সাভানা খ. তুন্দ্রা গ. তৃণভূমি ঘ. বনভূমি

ইকোসিস্টেমের প্রধান উপাদান কয়টি? সকল বোর্ড ২০১৯/

ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫

গরান বনভূমি রয়েছে কোন জেলায়? সকল বোর্ড ২০১৯/

ক. যশোর খ. মাগুরা গ. খুলনা ঘ. কুষ্টিয়া

নির্দিষ্ট পরিবেশে গড়ে ওঠা জীবমণ্ডলের বৃহৎ ভৌগোলিক একককে কী বলে? সকল বোর্ড ২০১৮/

ক. বাস্তুবিদ্যা খ. বাস্তুসংস্থান গ. বায়োম ঘ. বনভূমি

বাংলাদেশে শরৎ ও শীতকালে তাপমাত্রা কত থাকে?

ক. ১০ ° -২০°C   খ. ১২ ° -২২০০

গ. ১৪ ° -২৬°C   ঘ. ১৫ ° -২৮°০

-অ্যামিনো এসিড কোথায় ব্যবহৃত হয়?

ক. সালোকসংশ্লেষণে   খ. ব্যাকটেরিয়ার শ্বসনে

গ. এনজাইম সংশ্লেষণে   ঘ. নাইট্রেট সংশ্লেষণে

বায়ুদূষণ রোধে খনিজ তেলের পরিবর্তে মোটরযানে কোনটি ব্যবহার করা হয়?

ক. পেট্রোল   খ. গ্যাসোলিন   গ. ডিজেল   ঘ. প্রাকৃতিক গ্যাস

CFC কোন স্তরকে ধ্বংস করছে?

ক. আয়ন   খ. জীব   গ. ওজোন   ঘ. বায়ু

THANK YOU